বিতর্কিত পদ্মিনী
তুহিনা প্রকাশনী

পদ্মিনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সূর্যবংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজ-সিংহাসন নিয়ে কত ভাইয়ে-ভাইয়ে বিচ্ছেদ, কত মহাযুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অশ্রুপাতই হয়ে গেছে; কিন্তু এত রাজা, এত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে কেবল জনকতক রাজার নাম আর গুটিকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনো সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মহারাজ খোমান—যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য উপন্যাসের সেই বোগদাদের খালিফ হারুণ অল রসিদের ছেলে আল মামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেকদিন বন্দী রেখেছিলেন; আশীর্বাদ করতে হলে এখনো যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলে—"খোমান তোমায় রক্ষা করুন।" আর একজন মহারাজ সমরসিংহ—যেমন বীর তেমনি ধার্মিক! তিনি যখন নাগা-সন্ন্যাসীর মতো মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজের মালা গলায় ভবানীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন তখনকার দিল্লীশ্বর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দীন ঘোরি যখন দিল্লীর সিংহাসনের সঙ্গে অর্ধেক-ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন, সেই

সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরো হাজার রাজপুত আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে দাঁড়িয়ে, কাগার নদীর তীরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু—তাঁর আদরের মহিষী মহারানী, পৃথার ছোট ভাই। দুইজনে বড় ভালোবাসা ছিল। তাই বুঝি এই শেষ যুদ্ধে সমরসিংহ জন্মের মতো বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন। যখন যুদ্ধের দিনে প্রলয়ের ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ-লক্ষ হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত ছিন্ন-ভিন্ন; ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোনো আশা নেই, প্রাণের মায়া কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথ্বীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে-একে নিজের-নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চললেন, তখন একমাত্র সমরসিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন তুচ্ছ করে প্রাণের বন্ধু পৃথ্বীরাজের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে ঘোর-যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্মাত্মা মহাবীর সমরসিংহ, তাঁর ষোলো বছরের ছেলে কল্যাণ আর সেই তেরো হাজার রাজপুতের বুকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙা হয়ে গেল তবে পৃথ্বীরাজ বন্দী হলেন এবং দিল্লীর হিন্দু-সিংহাসন মুসলমান বাদশা শাহাবুদ্দীনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দীন কোথায়, কোথায় বা সেই দিল্লীর রাজভক্ত! কিন্তু যে ধমাত্মা বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করলেন, সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম রাজপুত কবিদের সুন্দর গানের মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে। এখনো রাজপুতানায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা করে।

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশ বৎসর কেটে গেছে চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রানা লক্ষ্মণসিংহ আর দিল্লীতে পাঠান-বাদশা আল্লাউদ্দীন। সেই সময় একদিন রানা লক্ষ্মণসিংহের কাকা ভীমসিংহ, সিংহল-দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে

ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সরোবর প্রফুল্ল করে ক্রমে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনি কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুত-রানী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে-দিনে সমস্ত ভারতবর্ষে আমোদ করলে। কি দীনদুঃখীর সামান্য কুটীর, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ—এমন সুন্দরী, এহেন গুণবতী কোথাও নেই। এই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের এক ধারে, সাদা-পাথরে-বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজা-অন্তঃপুরের শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময়ে একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান-বাদশাহ আল্লাউদ্দীন, খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে শরবতের পেয়ালাহাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গান গাইছিল। বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন, "কী ছাই, আরবীগজল হিন্দুস্থানের গান গান গাও।" তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল—"হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল—তার দোসর নেই, জুড়ি নেই সে কী ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল—চারদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল। দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জন করছিল! কার সাধ্য, সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য যে রাজার বাগিচার সে ফুল তোলে! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!"

আলাউদ্দীন বলে উঠলেন, "আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোনো রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোনো দেবতাকেও ভয় করি না পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব।" বাঁদী আবার গাইতে লাগল—"কে সেই ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল?—মেবারের রাজপুত-বীরের সন্তান—রানা ভীমসিংহ—নির্ভয়, সুন্দর!"

আল্লাউদ্দিন মছলন্দে সিংহাসনে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল—"আজ চিতোরের অন্তঃপুরে যে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা? জগতে তার জুড়ি কই? ধন্য রানা ভীমসিংহ! জয় রাজরানী—চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী।" আল্লাউদ্দীনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল—"চিতোরের রাজউদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!" "তিনি আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলে উঠলেন, "বাঁদী তুই কি স্বচক্ষে পদ্মিনীকে দেখেছিস? সে কি সত্যই সুন্দরী?" বাঁদী উত্তর করলে, "জাঁহাপনা! দিল্লী আসবার আগে আমি চিতোরে নাচ গান করে জীবন কাটাতেম, পদ্মিনীর বিয়ের রাত্রে আমি রানীর মহলে নেচে এসেছি।"

আল্লাউদ্দীন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন; কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, "পিয়ারী আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি।" পিয়ারী বেগম বলে উঠলেন, "শাহেনশা, আমার সাধ যায়, আকাশের চাঁদটাকে সোনার কৌটায় পুরে রাখি!" কথাটা আল্লাউদ্দীনের ভালো লাগল না। দিল্লীর বাদশা, যাঁর মুঠোর ভিতর অর্ধেক ভারতবর্ষ, তিনি কি একজন রাজপুতরানীকে ধরে আনতে পারেন না? শাহেনশা মুখ গম্ভীর করে উঠে গেলেন—মনে-মনে বলে গেলেন, "থাক পিয়ারী, যদি পদ্মিনীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদী হয়ে থাকতে হবে।"

তার পরদিন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দীন চিতোরের মুখে চলে গেলেন। পাঠান যে দিক দিয়ে গেল সেই দিকে পথের দুই ধারে, ধানের খেত, লোকের বসতি ছারখার করে যেতে লাগল।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে-দিকে আনন্দের রোল উঠেছে—"হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!" ঘরে-ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো-হো আর বাসন্তী রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি-খেলার মাঝখান, একদিন চিতোরে খবর পৌছল আল্লাউদ্দীন আসছেন—

ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ একনিমেষে নিভে গেল। তখন কোথায় রইল রানার রাজসভার ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথায় রইল রানীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে-লাল, রাস্তায় দলে-দলে হাসি-তামাশা, আর কোথায় বা গোপালজীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর!

আবিরে গোলাপে লালে-লাল চিতোরের ঘরে-ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌ার সঙ্গে আর-এক ভয়ংকর খেলার আয়োজন চলতে লাগল—সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ। শেষে একদিন পাঠান-বাদশার কালো নিশান শকুনির মতো মেবারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে। ভীমসিংহ হুকুম দিলেন, "কেল্লার দরজা বন্ধ কর।" ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দীন ভেবেছিলেন—যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব, কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিকে যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারিদিকে দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব! পাঠান বাদশা পাহাড়ের নিচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রানা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, "পদ্মিনী তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রসাদ ছিল, তেমনি সমুদ্র?" পদ্মিনী বললেন, "তামাশা রাখ, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?" ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাদে উঠলেন। অন্ধকার আকাশ—চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নিচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ

থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, ''রানা এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মা-গো, সাদা-সাদা ঢেউ উঠছে দেখ।'' ভীমসিংহ হেসে বললেন, ''পদ্মিনী, এ যে-সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যদল! ঐ দেখ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবির-শ্রেণী; জলের কল্লোলের মতো ঐ শোনো সৈন্যের কোলাহল। আর আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছে থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।''

ভীমসিংহ আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো-পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে নেমে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল—এ-কি অলক্ষণ! এ-কি অলক্ষণ!

তার পরদিন পূবের আকাশে ভোরের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন রাজপুতসওয়ার পাঠান-শিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দীন তখন রূপোর কুর্সিতে বসে তশবী-দানা জপ করছিলেন ; খবর হল, ''রানা লক্ষ্মণসিংহের দূত হাজির।'' বাদশা হুকুম দিলেন, ''হাজির হোনে কো কহো।'' রানার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, ''রানা জানতে চান বাদশার সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোরে উপস্থিত হলেন?'' আল্লাউদ্দীন উত্তর করলেন, ''রানার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই, আমি রানার খুড়ো ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাকে পেলেই দেশে ফিরব।'' দূত উত্তর করলে, ''শাহেনশা, আপনি রাজপুত-জাতকে চেনেন না, সেই জন্য এগন কথা বলছেন। রানার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত, আমরা

প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না; আপনি রানীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অন্য-কিছু নেবার থাকে তবে—" আল্লাউদ্দীন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা—হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ।" রানার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত-সর্দার একত্র হলেন, কি করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? রাজস্থানের রাজ-মুকুটের সমান চিতোর ; রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর। মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড়-বড় হিন্দুরাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মতো এখনো অটল, এখনো স্বাধীন আছে। কী করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরকে উদ্ধার করা যায়? অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ তর্কবিতর্ক চলল। শেষে রানা ভীমসিংহ উঠে বললেন, "পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্বনাশ উপস্থিত তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোন দুঃখ নেই, চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে।" কথাটা বলে ভীমসিংহ একবার রাজসভার এক পারে, যেখানে শ্বেতপাথরের জালির পিছনে চিতোরের রানীরা বসেছিলেন, সেইদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বললেন, "মহারানা কী বলেন।" লক্ষ্মণসিংহ বললেন, "যদি সমস্ত সর্দারের তাই মত হয়, তবে তাই করা কর্তব্য।" তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত-সর্দারের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান! পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নন, তিনি আমাদের রানীও বটে।কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীসুদ্ধ লোক বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রানীর হয়ে লড়ে? মহারানা, আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলে যুদ্ধে যাই।" মহারানা হুকুম দিলেন, "আপাতত

যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, সাবধানে কেল্লার দরজা বন্ধ রাখ, আল্লাউদ্দীন যতদিন পারে চিতোর ঘিরে বসে থাকুক!" সভাস্থলে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। চারিদিকে চিতোরের সমস্ত সামন্ত-সর্দার তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা একসঙ্গে বলে উঠল, "জয় মহারানার জয়! জয় ভীমসিংহের জয়! জয় পদ্মিনীর জয়!" রাজসভা ভঙ্গ হল। সেই সময় রাজসভার এক-পারে, শ্বেতপাথরের জালির আড়াল থেকে সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারের মাঝে এসে পড়ল। সর্দারের পদ্মিনীর হাতে সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে "রানীর জয়!" বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

তারপর, দিন কাটতে লাগল। আল্লাউদ্দীন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেল্লা ঘিরে বসে রইলেন। বাদশার আশা ছিল যে কেল্লার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে ; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে সংবৎসর কেটে গেল, তবু সন্ধির নাম-গন্ধ নেই। বর্ষা, শীত কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে, পাঠান-সৈন্যরা দিল্লীতে ফেরবার জন্যে অস্থির হতে লাগল। এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনি-চৌকে কত মজা! সেখানে কাফিখানায় কত আমোদ চলেছে! আর তারা কিনা, কি বর্ষা, কি হিম, এই হিন্দুর-মুল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে! এখানে না পাওয়া যায় ভালো পান-তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা—যার গান শুনলে ভুলে থাকা যায়! এখানকার লোকগুলোও যেমন কাটখোট্টা, তাদের গানগুলোও তেমনি বেসুরো, পানগুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুয়া। এ হিঁদুর মুল্লুকে আর মন টেকে না। আল্লাউদ্দিন দেখলেন, নিষ্কর্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ইচ্ছা আরো কিছুদিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন ; যে-কোনো উপায়ে হোক সৈন্যদের স্থির রাখতে হবে। বাদশা

তখন এক-একদিন এক-এক দল সৈন্য নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় একদিন শিকার শেষে আলাউদ্দিন শিবিরে ফিরে আসছেন! একদিকে সবুজ জনারে খেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মতো নীল হয়ে এসেছে, আর একদিকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে, মাঝে সুঁড়ি পথ, সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল বড় বড় হরিণ ঘাড়ে গাইতে গাইতে চলেছে, তারপর বড়-বড় আমীর-ওমরা কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সব শেষে বাদশা আল্লাউদ্দীন—এক হাতে ঘোড়ার লাগাম অন্য হাতে সোনার জিঞ্জীর-বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখি! বাদশা ভাবতে-ভাবতে চলেছেন—এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর দখল হল না ; সৈন্যরা দিল্লী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত, আর কতদিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায়? যে পদ্মিনীর জন্যে এত সৈন্য নিয়ে এক কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেন, সে পদ্মিনীকে তো একবার চোখেও দেখতে পেলেন না! বাদশা একবার বাঁ-হাতের উপর প্রকাণ্ড শিকরে পাখিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল—যদি কোনো রকমে দুখানা ডানা পাই, তবে এই বাজটার মতো চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি! হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দিন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ, নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো একজোড়া শুক-শারী উড়ে চলো। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন ; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি

শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন একটি পাখি ভয়ে চিৎকার করতে করতে সন্ধ্যার আকাশে বেড়াচ্ছে, আর একটি পাখি প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতরে ছটফট করছে। তিনি শিস দিয়ে বাজ-পাখিকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল, আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে-ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা-পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন! আর সেই তোতাপাখির জোড়া-পাখিটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে-ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে-সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল! শেষে, ক্রমে-ক্রমে আস্তে-আস্তে, ভয়ে-ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, "কী আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতী এসে আপনি ধরা দিয়েছে!" আল্লাউদ্দীন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছিলেন, হঠাৎ ওমরাহের মুখে এই কথা শুনে তাঁর মনে হল—যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রানী পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন।

বাদশা শিবিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। দু-একদিন পরেই রানার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হল যে আলাউদ্দীন সমস্ত পাঠান সৈন্য নিয়ে বিনা যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে একমাত্র তিনি একখানি আয়নার ভিতরে রাজপুত-রানী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন ততক্ষণ তাঁর কোনা বিপদে না ঘটে সেজন্য স্বয়ং মহারানা দায়ী রইলেন। বাদশা চিতোর যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে, আল্লাউদ্দীন স্বপ্নেও ভাবেননি ; তিনি মহা আনন্দে পাঠান-ওমারাহদের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির করলেন! তারপর বৈকালে গোলাপ-জলের স্নান করে, কিংখাবের জামাজোড়া, মোতির কণ্ঠমালা,

হীরে-পান্নার শিরপ্যাঁচ পরে শাহেনশা সাদা ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন—সঙ্গে প্রায় দুশোজন পাঠান-বীর—যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা। বাদশা ঘোড়ার চড়ে একা পাহাড় ভেঙে কেল্লার দিকে উঠে গেলেন ; আর সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নিচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তারপর আবার একে-একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেল্লার কাছে ফিরে এসে পথের প্রকাণ্ড একটা আমবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন, সেই সময় পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দীন রানা ভীমসিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেতপাথরের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না—কেবল হাজার হাজার মোমবাতির আলো, সেই শ্বেতপাথরের রাজমন্দিরে, যেন আর একটা নতুন দিনের সৃষ্টি করেছিল। রানা ভীম সেই ঘরে সোনার মছনদে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়ালা সরবত দিয়ে বললেন, ''শাহেনশা, একটু আমিল ইচ্ছা করুন।'' আল্লাউদ্দীন সেই আমিলের পেয়ালা হাতে ভাবতে লাগলেন— যদি এতে বিষ থাকে, তবে তো সর্বনাশ! রাজপুতের মেয়েরা শুনেছি, শত্রুর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। বাদশা পেয়ালা-হাতে ইততস্ত করতে লাগলেন। রানা ভীম আল্লাউদ্দীনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বললেন, ''শাহেনশা, বিষের ভয় করবেন না। মহারানা স্বয়ং যখন আপনার কোনো বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী, তখন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন, তবু একজন রাজপুতও আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না! আপনি নিশ্চিত থাকুন। অতিথিকে আমরা দেবতার মতো মনে করি।'' আল্লাউদ্দীন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ''রানা, আমি সে কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছিলেম, আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি, তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস

করতে পার কি না?" আল্লাউদ্দীন মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল। তিনি অল্পে-অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃসেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। শেষে দেখলেন বিষের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, "তবে আর বিলম্ব কেন? এখন একবার সেই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনী রানীকে দেখতে পেলেই খুশি হয়ে বিদায় হই।"

তখন রানা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিলেন—কাকচক্ষু জলের মতো নির্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার-হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন সে কি কালো চোখ! সে কি সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দুখানি হাত। বাঁকা মল-পরা কি সুন্দর দুখানি রাঙা পা! ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক্! বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন—একি মানুষ না পরী? আল্লাউদ্দিন আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি মছনদ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে ছুটে চললেন ; গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়। ভীমসিংহ বলে উঠলেন—"শাহেনশা, পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।" রানার মনে হল, রাজ-দরবারের একদিকে বসে সত্যই তাঁর পুণ্যবতী রানী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছে। রাগে রানীর দুইচক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে, সজোরে ছুঁড়ে মারলেন—ঝনঝন শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আল্লাউদ্দীন

চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মনে বুঝলেন, পাগলের মতো রানীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়ই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রানার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার।

বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, ''রানা অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত, তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম। আমায় ক্ষমা করুন।''— তারপর অনেক তোষামোদ, অনেক অনুনয়-বিনয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন। পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রানার প্রাণ খুলে গিয়েছিল তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল—রানা আদর করে নতুন বন্ধু দিল্লীর বাদশাকে কেল্লার বাইরে পৌঁছে দিতে চললেন।

অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার ; ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ—সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে, চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই, আল্লাউদ্দীন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ার চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রানা ভীম আর কুড়িজন রাজপুত্র সেপাই।

আজ রানার মনে বড় আনন্দ—চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লাউদ্দিন সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখনো চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। রানা যখন ভাবলেন, কাল সকালে পাঠান সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা কাল থেকে নির্ভযে রানা রানীর জয়-জয়কার দিয়ে, যে যার কাজে লাগবে, তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে-পাশে ঘোড়ার চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরও অন্ধকার হয়েছে ; পাহাড়ের গায়ে বড়-বড় নিমগাছ কালো-কালো দৈত্যের মতো রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল কেল্লার

উপর থেকে এক-একবার প্রহরীদের হৈ-হৈ আর পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট।

আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহকে নিয়ে কথায়-কথায় ক্রমে পাহাড়ের নিচে এলেন। সেখানে একদিকে জমারে খেত, আর একদিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা। এই রাস্তার দুইধারে প্রায় দুশো পাঠান আল্লাউদ্দীনের হুকুম মতো লুকিয়েছিল। ভীমসিংহ যেমন এলেন অমনি হঠাৎ চারিদিক থেকে পাঠান -সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলল ; তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত-শত শত্রুর মাঝে কুড়িজন মাত্র রাজপুত্র তাদের রানাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু বৃথা! বাজপাখি যেমন ছোঁ-মেরে শিকাশ নিয়ে যায়, তেমনি পাঠান আল্লাউদ্দীন রাজপুতদের মাঝখান থেকে রানা ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন রাজপুত চিতোরে ফিরল। প্রতিপদের সকালবেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল— ভীমসিংহ বন্দী হয়েছেন, পদ্মিনীকে না দিয়ে তাঁর মুক্তি নেই।

আল্লাউদ্দিন যখন শিবিরে পৌঁছলেন, তখন রাত্রি আড়াই প্রহর। তিনি ভীমসিংহকে সাবধান বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন। আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রানা যখন ধরা পড়েছেন, তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়! হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, বাদশার বেগম হতে কি রাজী হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রানাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না।—আল্লাউদ্দিন মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়া দুধের ফেনার মতো ধপধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরানী পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন, এইবার পদ্মিনী আসছেন। সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল, পদ্মিনী এলেন না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলে গেল, তবু পদ্মিনীর দেখা নেই। বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হতে লাগল এ ভীমসিংহ কি আসল ভীমসিংহ নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোনো

সর্দারকে বন্দী করে এনেছি? আল্লাউদ্দিন বন্দী রানাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রানা বাঁধা সিংহের মতো বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন। শাহেনশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ?" রানা উত্তর করলেন, "পাঠান! এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?" আল্লাউদ্দীন বললেন, "যদি তুমি সত্যই ভীমসিংহ হবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য রাজপুতদের কোনোই চেষ্টা দেখছি না যে?" রানা বললেন, "যে মূর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গে চিতোরের মহারানা বোধ হয় আর কোনো সম্বন্ধ রাখতে চান না!" কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল—যদি, সত্যিই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন? আল্লাউদ্দীন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন।

সেইদিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাদে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন! নীল পথের মতো তাঁর দুটি সুন্দর চোখ, পাঠান শিবিরের দিকে—যেখানে ভীমসিংহ বন্দী ছিলেন, সেই দিকে চেয়ে ছিল। আকাশ তখনো পরিষ্কার হয়নি, পূর্বদিকে সূর্যের আলো সোনার তারের মতো দেখা দিয়েছে, এমন সময় দুজন রাজপুত-সর্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম করলেন। একজনের নাম গোরা, আরেকজনের নাম বাদল। গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর তার বড়-ভাইয়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর বারো। গোরা বাদল দুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক। রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রানী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক -হাতে তলোয়ার, আর হাতে মা-বাপ-হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরে এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারানা কি আমার কথা মতো কাজ করতে রাজী হয়েছে?" গোরা বললেন, "তাঁরই হুকুমে রানীজীকে পাঠানশিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্যেই এখনি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।" পদ্মিনী একটু

হেসে বললেন, "যাও বাদশাকে বোলো, আমার জন্যে যেন দিল্লীতে একটা নতুন মহল বানিয়ে রাখেন।"

গোরা বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে-দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করে সূর্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন, আল্লাউদ্দীনের লাল রেশমের প্রকাশ শিবির সকালবেলার সূর্যের আলোয় ক্রমে-ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল। তিনি বাদশাহের সেই কানাতের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলে উঠলেন— "ধূর্ত পাঠান, তোতে-আমাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখি, কার কতদূর ক্ষমতা!" সেদিন শুক্রবার,মুসলমানদের জুম্মা। আল্লাউদ্দিন ফজিরের নমাজ করে দরবারে বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে গোরা বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহারানার মোহর করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা রয়েছে—পদ্মিনীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল, তার বদলে রানা ভীমসিংহের মুক্তি চাই! আরও রাজধানী পদ্মিনী সামান্য স্ত্রীলোকের মতো দিল্লীতে যেতে পারেন না, তাঁর প্রিয় সখীরাও যাতে পদ্মিনীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারেন, বাদশাহ যেন সে বন্দোবস্ত করেন, তাছাড়া চিতোরের রানী পদ্মিনীকে শাহেনশার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্যে যে-সব বড়-বড় ঘরের রাজপুতানী সঙ্গে যাবেন, তাঁদের যাতে কোনো অসম্মান না হয়, সেজন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছু দূরে সরিয়ে রাখবেন। শেষে মহারানার ইচ্ছা যে, এর পর থেকে আল্লাউদ্দীন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন।" চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল ; তিনি হাসিমুকে গোরা বাদলের দিকে ফিরে বললেন, "বেশ কথা! আমি আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রানীর আসবার কোনোই বাধা হবে না। তোমরা মহারানাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজী হলেম।"

গোরা বাদল বিদায় হলেন। বাদশা, কেল্লার সামনে থেকে সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অন্য জায়গায় উটিয়ে

নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বললেন—তাম্বুকানাত, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাব-পত্র যেখানকার সেইখানেই থাক, কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে একদিনের মতো অন্য কোথাও আশ্রয় নিক। তাতেও প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রামপালের উপর কড়কড় শব্দে নাকাড়া বাজতে লাগল। বাদশা দেখলেন, চিতোরের সাতটা ফটক একে-একে পার হয়ে চার-চার বেহারার কাঁধে, প্রায় সাতশো ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে—মাঝে রানী পদ্মিনীর চিনাপোত-মোড়া সোনার চতুর্দোল, তার এক-পাশে পঞ্চাশ বৎসরের সর্দার গোরা, আর একপাশে বারো বৎসরের বালক বাদল—দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে। পদ্মিনী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্যে বাদশা প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন। একে-একে যখন সেই সাতশো পাল্‌কি কানাতের ভিতরে পৌঁছল, তখন গোরা বাদশার হুজুরে খবর জানালেন, "শাহেনশা, রানীজী উপস্থিত; এখন তিনি একবার ভীমসিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান—বাদশাহের বেগম হলে অঅর তো দুজনে দেখা হবে না।" বাদশা বললেন, "পদ্মিনী যখন রানাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আর কথা কী! আমি আধঘণ্টাা সময় দিলাম, তার বেশি রানা যেন পদ্মিনীর কাছে না থাকেন।" গোরা তথাস্তু বলে বিদায় হলেন।

আলাউদ্দিন একলা বসে দেখতে লাগলেন—এক, দুই করে প্রায় সাতশো পালকি, কানাতে ভিতর থেকে বেরিয়ে, চিতোরের মুখে চলে গেল ; সঙ্গে ঘোড়ার চড়ে বারো বৎসরের বাদল। বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাস করলেন, "এসব পালকিতে কারা যায়?" শুনলেন, চিতোর থেকে যে-সকল বড়-ঘরের রাজপুতানী রানীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তারা ফিরে গেলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভীমসিংহ কোথায়?" উত্তর হল "অন্দরে আছেন।"

আল্লাউদ্দিন শিবিরে এককোণে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ করবার জন্য অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতর গোলাপ, হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি-কোথাও সোনার আতরদান হাজার টাকা ভরি গোলাপী আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপাঁচ, কৌটো-ভরা মানিকের আংটি, আলনায় সাজানো কিংখাবের জামাজোড়া, রেশমী রুমাল, জরির লাপেটা।

বাদশা যতক্ষণ কিংখাবের জামাজোড়া, জরির লাপেটা পরে আয়নার সম্মুখে পাকা দাড়িতে গোপালী আতর লাগাচ্ছিলেন, ততক্ষণ সেই সাতশো পালকির একখানিতে রানা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছা-বাছা রাজপুত-সর্দারেরা পাঠান-শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছেন।

ক্রমে আল্লাউদ্দীনের সাজগোজ সাঙ্গ হল। আধ-ঘণ্টা শেষ হয়ে একঘণ্টা পূর্ণ হতে চলল, এখনো পদ্মিনীর শিবির থেকে ভীমসিংহ ফিরে এলেন না! বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন, গোরার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। আল্লাউদ্দীন অআর স্থির থাকতে পারলেন না, বাধ্য হয়ে যেখানে আধক্রোশ জুড়ে কানাত খাটানো হয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হলেন ; দেখলেন পদ্মিনীর সোনার চতুর্দোল শূন্য পড়ে আছে। যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি চিতোরের রানী পদ্মিনীকে মানিকের খাচায় সোনার পাখিটির মতো পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন, সে শিবির অন্ধকার!

কোথায় পদ্মিনী, কোথায় তাঁর একশো সখী আর কোথায় বা বন্দী ভীমসিংহ ; পাঠান-শিবিরে হুলস্থূল পড়ে গেল। সকলেই শুনলে পালকি-বেয়ারা সেজে রাজপুতেরা বন্দী রানাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল।

বাদশা তখনি সমস্ত সৈন্য জড়ো করতে হুকুম দিতে দুহাজার ঘোড়-সওয়ার সঙ্গে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন।

সবেমাত্র রানার পালকি চিতোরের ফটক পার হয়েছে, এমন সময় পাঠান বাদশার ঘোড়-সওয়ার কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ধূলিধ্বজায় চারিদিক অন্ধকার করে দীন্-দীন্-শব্দে রাজপুত সৈন্যের উপর পড়ল।

তখন বেলা দুই প্রহর। আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা। একদল রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু যুদ্ধের শেষ হল না। চিতোর থেকে দলের পর দল রাজপুত এসে যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল ; বাদশা হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্যন্ত দখল করতে পারলেন না। শেষে, যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ রেখেছিলেন, সেই ভীমসিংহ যখন হাতির পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তখন পাঠান বাদশার আসা-ভরসা নির্মূল হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আর্ধেক-ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন। জয়! জয়! রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধ-শেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন, তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?" রানা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "পদ্মিনী, আজ আমার পরম উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মতো যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে, দেবলোকে চলে গেছে।" দুজনে আর একটিও কথা হল না। রানী পদ্মিনীর শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন ; দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায়-হায়-হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল। আল্লাউদ্দিন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু একটু করে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজপুতের কাছে হার মেনে বাদশা নিজের শিবিরে

এসে শুনলেন—মোগল বাদশা তৈমুরলং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন ; তার এক জায়গায় বেগম লিখেছিলেন, "শাহেনশা, আর কেন? পদ্মিনীর আশা পরিত্যাগ করুন। হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক লুটে গেল— সকলি আল্লার ইচ্ছে। আজ অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা, কাল হয়তো পথের ভিখারী। হায় রে হায়, দিল্লীর পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল-দস্যুর বাঁদী হতে হল! বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলেন। বিপদ যে এত গুরুতর, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ শিবির ওঠাতে হুকুম দিলেন। সেই রাত্রে পাঠান-ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল।

তেরো বৎসর পরে, চিতোরের সম্মুখে পাঠান-বাদশার রণডঙ্কা, আর একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড় দুরবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে—দেশ প্রায় বীরশূন্য ; নতুন নতুন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রানা ভীমসিংহ সেই সব নতুন সৈন্য নতুন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে-গ্রামে, পথে-পথে পাঠান সেন্যকে বাধা দিতে লাগলেন ; কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে-করতে একদিন আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহী ফৌজ চিতোরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপর গড়বন্ধী তাঁবু সাজিয়ে, রাজপুতের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা, চিতোরের কেল্লা ভূমিসাৎ না করে দিল্লী ফেরা নয়।

মলিন মুখে রানা ভীমসিংহ চিতোর-গড়ে ফিরে এলেন। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বললেন, "কাকাজি, এক দিনে

বুঝি চিতোরগড় পাঠানের হস্তাগত হয়, আর উপায় নেই! প্রজা সকল হাহাকার করছে, সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত! এখন কী নিয়ে, কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?" ভীমসিংহ বললেন, "চিতোর এখনো বীরশূন্য হয়নি, এখনো আমরা একবৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি, এমন ক্ষমতা রাখি!" লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন, "কাকাজি, আর যুদ্ধ বৃথা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নেই ; তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশ-জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে, যদি আগুন নিভে যায়, তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করায় ক্ষতি কী? না-হয় কিছুকাল পাঠান বাদশার একজন তালুকদার হয়েই কাটালাম।"

ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল; তিনি মহারানার দুটি হাত ধরে বললেন, "হায় লচমন, মনে বেশ বুঝেছি আর উপায় নেই, তবু আমার একটি অনুরোধ আছে। দুই বৎসর বয়সে যখন তোর মা গেলেন বাপ গেলেন, তখন আমিই তোকে ছেলের মতো বুকে টেনে নিয়েছিলাম ; সমস্ত বিপদ-আপদ, রাজ্যের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা তোরই হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেম। আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর বৎস। সাতদিন সময় দে। আমি এই শেষবার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা দেখি! এই সাতদিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাতদিনে যেন আমার হুকুম মহারানার হুকুম জেনে সকলে মান্য করে।"

লক্ষ্মণসিংহ বললেন, "তথাস্তু।"

সেইদিন থেকে ভীমসিংহের হুকুমমতো এক-একজন রাজপুত সর্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন।

প্রতিদিন খবর আসতে লাগল—আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন—চিতোরের ঘরে-ঘরে হাহাকার

উঠল! সেই হাহাকার, সেই হাজার-হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন, পদ্মসরোবরের মাঝখানে, যেখানে রাজরানী পদ্মিনী শ্বেতপাথরের দেবমন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, সেইখানে পৌঁছল! পদ্মিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূজা সাঙ্গ করলেন। তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পবিবার অনাথ শিশুর জন্যে সারা দিন, কেবলই কাঁদতে লাগল।

ভীমসিংহ যখন মহলে এলেন তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় করে বললেন, "প্রভু, আর কতদিন যুদ্ধ চলবে?" ভীমসিংহ বললেন, "তিন দিন মাত্র। কিন্তু যুদ্ধে আর কোনো ফল নেই, রাজপুতের প্রাণে সে উৎসাহ আর নেই। এখন উপায় কী? সূর্যবংশের মহারানাকে এইবার বুঝি পাঠান-বাদশার তালুকদার হতে হল।" পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, চিতোর রক্ষার কি কোনোই উপায় নেই?" ভীমসিংহ বললেন, "উবরদেবী যদি কৃপা করেন, তবেই রক্ষে! হায় পদ্মিনী, কার পাপে চিতোরের এ দুর্দশা হল।" তারপর দু-একটি কথার পর ভীমসিংহ অন্য কাজে চলে গেলেন। একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলই বাজতে লাগল—হায় পদ্মিনী, কার পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দশা! অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাত করে উঠলেন, "হায়, হতভাগিনী পদ্মিনী, তোরই এ পোড়া-রূপের জন্যে এ সর্বনাশ—তোরই জন্যে এ সর্বনাশ।"

নিঃশব্দ ঘরে প্রতিধ্বনিত হল— "তোরই জন্যে সর্বনাশ!"

ঠিক সেই সময় চৈত্র মাসের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবরদেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, উবরদেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল একটিমাত্র প্রদীপের আলো! সেই আলোয় বসে দেবীর ভৈরবী, রাজরানী পদ্মিনীকে বললেন, "মহারানী, আমি আবার বলি, তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রত্ন-অলংকার একবার অঙ্গে পরলে

আর নিস্তার নেই! ছয়মাসের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হবে।" পদ্মিনী বললেন, "হে মাতাজী, আশীর্বাদ করুন, যে রূপসীর জন্যে রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলছে, তার সেই পোড়া-রূপ জ্বলন্ত আগুনেই ভস্ম হোক।" ভৈরবী বললেন, "তবে তাই হোক বৎসে, আমি আশীর্বাদ করি, যে চিতোরের জন্যে তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করলে, সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে, যে মহাসতীর রত্ন অলংকার আজ তুমি পরতে চললে, সেই মহাসতী মরণান্তে তোমায় যেন চরণে রাখেন।" রানী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি চন্দন কাঠের কৌটায় উবরদেবীর সমস্ত রত্ন-অলংকার নিয়ে বিদায় হলেন।

সেইদিন রাত্রে প্রায় আড়াই প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি সাড়াশব্দ ছিল না—মহারানা নির্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত প্রজা, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে, দেশে শান্তি আসবে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল, সেই সময়ে সমস্ত মেবারের রাজা, ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা লক্ষ্মণসিংহের চোখে ঘুম ছিল না। হায় অদৃষ্ট! কাল সন্ধির সঙ্গে-সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে, এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না! রাজ্য, সম্পদ, মান, মর্যাদা, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কোন দূরদেশে সামান্য বেশে নির্বাসনে যেতে হবে। মহারানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এককোণে সোনার দীপদানে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—একটিমাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরো যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল। মহারানা অন্তঃপুরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠল ; তারপর মহারানা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নুপূরের ঝিন-ঝিন শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মহারানা বলে উঠলেন,

' 'কে তোরা? কী চাস?" চারিদিকে—দেওয়ালের ভিতর থেকে, ছাদের উপর থেকে, পায়ের নিচে থেকে শব্দ উঠল— "ম্যায় ভুখা হুঁ!" লক্ষ্মণসিংহ বললেন, ' 'আঃ, এতরাত্রে চিতোরের রাজপ্রসাদে উপবাসে কে জাগে?" আবার শব্দ উঠল,— ' 'ম্যায় ভুখা হুঁ!" তারপর গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে ওঠে তেমনই সেই শয়নঘরে অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্তি ধীরে-ধীরে উঠল। মহারানা বলে উঠলেন, ' 'কে তুমি, দেবতা না দানব, আমার ছলনা করছ?" লক্ষ্মণসিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলংকারে, অসংখ্য-অসংখ্য মণিমাণিক্যে হাজার-হাজার আগুনের শিখার মতো দপ-দপ করে জ্বলতে লাগল। লক্ষ্মসিংহ দেখলেন—চিতোরেশ্বরী উবরদেবী!

ভয়-ভক্তি বিস্ময়ে মহারানার সর্বশরীর অবশ হয়ে এল— পরমানন্দে দুর্বল তাঁর হাত থেকে সোনার প্রদীপ খসে পড়ল। তারপর, সব অন্ধকার! সেই অন্ধকারে মহারানা স্বপ্ন দেখছেন, কি জেগে আছেন, বুঝতে পারলেন না! তিনি যেন সব শুনতে লাগলেন, দেবী বলছেন— ' 'ম্যায় ভুখা হুঁ।" বড় ক্ষুধা, বড পিপাসা, আমি মহাবলি চাই—রক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নেই। মহারানা! ওঠো, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত কর— আমার খর্পর রক্তের শতধারায় পরিপূর্ণ কর। রাজা-প্রজা বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে, তবেই কল্যাণ! না হলে, সূর্যবংশের রাজপরিবার আর কখনো চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না।"

পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনই সেই প্রকাণ্ড ঘরে দেবীর শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম-গম করতে লাগল।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল। উষাকালে সোনার আলো আর শতীল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্ধান করলেন! অনেকদূরে পার্বতী মন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবীরাগিণীতে মহাদেবীর স্তুতি-গান বাজতে

লাগল। প্রত্যুষে রাজদরবারে মহারানা লক্ষ্মণসিংহ যখন রাত্রে ঘটনা অআর দেবীর আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন, তখন সকলে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল, ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল। অআর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ, মন দুর্বল, যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুখে-স্বচ্ছন্দের দিন কাটাবে ভেবেছিল তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। কিন্তু সেই রাত্রে মহারানার আদেশ মেবারের ছোট-বড় সামন্ত সর্দারেরা যখন দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনবার জন্য অন্তঃপুরে সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ রাজপুরে হাজার-হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবীমূর্তি "ম্যায় ভূখা হুঁ।" বলে প্রকাশ হলেন, তখন অআর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না—সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্বলতা নিমেষের মধ্যে দূর হল—আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল ; কেবল রানা ভীমসিংহ যেন সেই দেবীমূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে-মনে তোলা-পাড়া করতে লাগলেন—একি দেবী, না পদ্মিনী? পদ্মিনী, না দেবী? দেবী?

তারপর, মহাবলির উদ্যোগ হল। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ তাঁর বারোটি রাজপুত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বড় রাজকুমার, যুবরাজ অরিসিংহের মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বললেন, "হে ভাগ্যবান, দেবীর আদেশ শিরোধার্য কর। পাঠান-যুদ্ধে অগ্রসর হও! আজ তুমি সমস্ত মেবারের মহারানা। এই সমস্ত সামন্ত-সর্দার তোমারই প্রজা বলে জানবে। আজ থেকে তোমারই হাতে যুদ্ধের ভার; জয় হলে তোমার পুরস্কার—ইহলোকে চিতোরের রাজসিংহাসন ; আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার ফল—পরলোকে মহাদেবীর অভয়চরণ।" বৃদ্ধ রানা লক্ষ্মণসিংহ অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিচে দাঁড়ালেন—নতুন রানার মাথায় চিতোরের কিরীট শোভা পেতে

লাগল। চারিদিকে রব উঠল— "জয় মহাদেবীর জয়।" "জয় অরিসিংহের জয়!" লক্ষ্মণসিংহ বলতে লাগলেন, "সর্দারগণ, আমার আর একটি শেষ কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য দেবীর কাছে নয়, চিতোরের কাছে নয় ; আমার পিতা-পিতামহ স্বর্গীয় মহারানাদের কাছে। এই মহাসমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নির্মূল না হয়, পরলোকে পিতৃ-পুরুষেরা যাতে জল গণ্ডুষ পান, রাজস্থানে বাপ্পার বংশে যুগে-যুগে যাতে অমর থাকে, সেই জন্যে আমার ইচ্ছা, অজয়সিংহ নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কৈলোরের নির্জন দুর্গে চলে যান।"

অজয়সিংহ মহারানার সম্মুখে জোড় হাত করে বললেন, "পিতা, আমার এগারো ভাই চিতোরের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর আমি কিনা স্ত্রীলোকের মতো শিশু-সন্তান মানুষ করবার জন্যে বসে থাকব? আমি কি এতই দুর্বল, এমনি অক্ষম?" লক্ষ্মণসিংহ বললেন, "বৎস হতাশ হয়ো না, যে মহৎ কাজের ভার তোমায় দিলেম, চিতোরের যে কোনো রাজপুত সে-ভার পেলে নিজেকে ধন্য বোধ করত। হয়তো আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না, হয়তো তোমাকেও চিতোরের জন্যে প্রাণ পণ করতে হবে। আমরা হয়তো চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব, আর হয়তো তুমি সূর্যবংশের উপযুক্ত কোনো বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে! মনে রেখ, চিতোরের জন্যে প্রাণ দেবার যে সুখ চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুণ।" লক্ষ্মণসিংহ নীরব হলেন। জয় জয় শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হল।

রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে বলে গেলেন, "চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।" যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে অজয়সিংহ যখন বড় ভাইয়ের ঘরে গেলেন, তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ করে ছোট-ভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, "ভাই, আজ আমাদের শেষ দেখা ; কাল তুমি একদিকে, আমি একদিকে। এই শেষ-দিনে তোমায় একটি কাজের ভার দিচ্ছি।"

অরিসিংহ চামড়ায়-মোড়া একটি ছোট থলি আর সেই চিঠিখানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বললেন, "অজয়, এ দুটি যত্ন করে রেখো, যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, তবে আবার চেয়ে নেব, নয় তো তুমি খুলে দেখো আমার শেষ ইচ্ছা কী।" তারপর অজয়সিংহকে আলিঙ্গন করে অরিসিংহ বললেন, "চল ভাই, মায়ের কাছে বিদায় হই।" সেদিন শেষরাতে যখন রাজঅন্তঃপুর থেকে দুই রাজপুত্র দুইদিকে বিদায় হয়ে গেলেন, তখন বারো ছেলের মা-জননী চিতোরের মহারানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন,—তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল দুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—যে দিক দিয়ে দুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারানা বলতে লাগলেন, "প্রিয়ে, স্থির হও, ধৈর্য ধরো, বুক বাঁধো, মহাকালের কঠোর বিধান নতশিরে শান্ত-মনে বহন কর।" তারপর রণরণ শব্দে রাজপুতের রণডঙ্কা দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল—যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানদেব বিরুদ্ধে রাজপুতদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। একের পর এক, এগারোজন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আর আশা নেই ; আর উপায় নেই। কিন্তু তবু রাজপুতের বীরহৃদয় এখনো অটল রইল।

চিতোরের শেষ দুই বীর, লক্ষ্মণসিংহ আর ভীমসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রানার হুকুমে মেবারের লক্ষ-লক্ষ সৈন্যসামন্তের অবশেষ— ভীষণমূর্তি ভগবান একলিঙ্গের দশ-হাজার দেওয়ানী-ফৌজ একত্র হতে লাগল। তাদের একহাতে শূল, একহাতে কুঠার, দুইকানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের অঙ্গরেখা, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড ঢাল! তাদের আসবারের মধ্যে এক গোড়া, এক কম্বল, এক লোটা—পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিল না। তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র একলিঙ্গজীর উপাসনা করত, মানুষের

মধ্যে কেবলমাত্র মহারানার হুকুম মানত। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্তা। ছোটখাট যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেত না ; কেবল মাঝে-মাঝে ঘোর দুর্দিনে, যখন চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসত, যখন বিধর্মীর হাতে অপমান হবার বয়ে দেশের যত সুন্দরী—কী কুমারী, কী বিধবা, কী দশ বছরের কচিমেয়ে, কী ষোলো বছরের পূর্ণ যুবতী—চিতার আগুনে রূপযৌবন ছাই করে দিয়ে, চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জহরব্রত উদ্‌যাপন করত, যখন আর কোনো আশা, কোনো উপায় নেই, সেই সময়, হতাশ রাজপুতের শেষ-উৎসাহের হতো দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত এই দেওয়ানী ফৌজ চিতোরের কেল্লায় দেখা দিত! সত্তর বৎসর পূর্বে সমরসিংহের বিধবা রানী কর্মদেবী একদিন কুতুবুদ্দীনের হাত থেকে ছেলের রাজ-সিংহাসন রক্ষা করবার জন্যে মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন; সেইদিন একবার দেওয়ানী ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কয় পুরুষ পরে মহারানা লক্ষ্মণসিংহের হুকুমে দেওয়ানী-ফৌজ আর একবার চিতোরের কেল্লায় উপস্থিত হল।

কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ-সংসার গ্রাস করছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য যখন লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো-হাজার রাজপুত সুন্দরীর জহর-ব্রত আরম্ভ হল।

মদিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম-সুন্দরী রানী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, "হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এস। পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এস! তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ংকর, আমাদের ভয় দূর কর, সন্তাপ নাশ কর, আশ্রয় দাও। লজ্জা নিবারণ, দুঃখ বিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি!" পদ্মিনী নীরব হলেন। বারো-হাজার রাজপুত মেয়ে সেই

অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে গাইতে লাগল—"লাজহরণ! তাপবারণ!" হঠাৎ একসময় মহা কল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল। বারো হাজার রাজপুতানীর সঙ্গে রানী পদ্মিনী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন—চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক-নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল। সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর হতে চিৎকার উঠল—"জয় মহাসতীর জয়!" আল্লাউদ্দীন নিজের শিবিরে শুয়ে চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন। পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের স্রোতের মতো রাজপুত-সেনা হর-হর শব্দে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ংকর তেজে পাঠান সৈন্যের উপর এসে পড়ল।

আল্লাউদ্দীনের সৈন্য দেওয়ানী-ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ছারখার হয়ে পলায়ন করলে। আল্লাউদ্দিন নতুন-নতুন সৈন্য এনে বারংবার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন—স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো তাঁর সমস্ত চেষ্টা প্রতিবার বিফল হল।

আল্লাউদ্দীন নিজে একজন সামান্য বীরপুরুষ ছিলেন না, এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড়-বড় হিন্দু রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন, কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতদের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেতে হল। বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন, বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল; আল্লাউদ্দীন বেশ বুঝলেন আজ যুদ্ধের সহজে শেষ নেই। একদিকে দিল্লীর বাদশাহীর তক্ত, আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন—কোনটা থাকে কোনটা যায়। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আল্লাউদ্দিন নিজের সমস্ত ফৌজ একেবারে একসময়ে সেই বারো হাজার রাজপুতের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে পাঠান বাদশার

লক্ষ-লক্ষ হাতি-ঘোড়া সেপাই-শাস্ত্রী প্রলয়-ঝড়ের মতো ধূলায়-ধূসর চারিদিক অন্ধকার করে দীন্-দীন্ শব্দে রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল। তারপর হটাৎ একসময়, সমুদ্রের তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনি সেই অগণিত পাঠান সৈন্যের মাঝে কয়েক হাজার রাজপুত কোনখানে লুপ্ত হল, কিন্তু আর দেখা গেল না কেবল সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে সেই যুদ্ধরত অসংখ্য সৈন্যের মাথায় উপরে সূর্যমূর্তিলেখা চিতোরের রাজপতাকা একবার মাত্র সন্ধ্যার আলোয় বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, তারপরেই শব্দ উঠল— "আল্লা হো আকবর, শাহেনশা কি ফতে!" পাঠানের পায়ের তলায় মহারানার রাজচ্ছত্র চূর্ণ হয়ে গেল। সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন; রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপর দলে-দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

চিতোর হস্তগত হল।

পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথঘাট রক্তের স্রোতে রাঙা করে তুললে; ধনধান্যে মণিমুক্তায়, লক্ষ-লক্ষ তাতার ফৌজের বড়-বড় সিন্দুক পরিপূর্ণ হল! কিন্তু যে-রত্নের লোভে আল্লাউদ্দীন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান করে দিলেন, যার জন্যে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন, সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি?

বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই শুনলেন—পদ্মিনী আর নেই—চিতার আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে!

সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর-দ্বার, মন্দির-মঠ—ছাইভস্ম চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল—কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানে রানী পদ্মিনীর রাজমন্দির তেমনি নতুন, তেমনি অটুট রইল। আল্লাউদ্দীন সেই রাজমন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে শ্বেতপাথরের বারান্দায়-ঘেরা পদ্মিনীর শয়নমন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম করলেন। তারপর মালদেব নামে একজন রাজপুতের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে, ধীরে-ধীরে দিল্লীর মুখে চলে গেলেন।

পাটান-বাদশার প্রবল প্রতাপ, হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আর একদিকে বিস্তৃত হল। আর সেই বারো হাজার সতী-লক্ষ্মীর পবিত্র নাম বারো হাজার রাজপুত বীরের কীর্তি, চিরদিনের জন্যে, জগৎ-সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিতোরের মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায়, তার ভিতর মানুষে প্রবেশ করেত পারে না—এক অজগর সাপ দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।

হিন্দুর প্রতি অসহিষ্ণুতা বন্ধ করুন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

যে-পদ্মাবতী চলচ্চিত্রটিকে ঘিরে এত বিতর্ক শুরু হয়েছে, বুঝতে হবে সেই রানি পদ্মিনী এক বিশাল সংখ্যক হিন্দু ভারতীয়ের কাছে প্রায় দেবীর সম্মানে পূজিতা হয়ে থাকেন। সেই আবেগকে কোনও ভাবে আঘাত করা কিন্তু কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্ম হতে পারে না। যাঁরা দিনের পর দিন এভাবে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, ঐতিহ্যের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত হানছেন— তাঁদের দায়িত্ববোধ নিয়েও তো প্রশ্ন উঠছে।

সঞ্জয় লীলা বনসালি পরিচালিত পদ্মাবতী চলচ্চিত্রটিকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশেই এখন এক জোরদার বিতর্ক শুরু হয়েছে। শুধু বিতর্ক বললে হবে না, বিতর্কের মাত্রা ছাড়িয়ে বিষয়টি এখন মারমুখী আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। বলতে গেলে, পদ্মাবতী চলচ্চিত্রটির শুটিং পর্ব থেকেই বিতর্কটি ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে। যত দিন গিয়েছে, বিতর্কটি চড়া মাত্রায় পৌঁছেছে। এই চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন কর্ণি সেনা এবং রাজস্থানের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষদের অভিযোগ—চলচ্চিত্রে রানি পদ্মিনীর চরিত্রকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। রাজস্থানের মানুষের কাছে রানি পদ্মিনী এক আবেগ। আত্মত্যাগ এবং ভারতীয় নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রতীক। স্বাভাবিক ভাবেই সেই চরিত্রে আঘাত হানার সামান্যতম সংবাদটুকুও রাজস্থানের মানুষদের এবং হিন্দু সমাজের গরিষ্ঠ অংশকে ক্ষুব্ধ করবেই।

অভিযোগ উঠেছে—পদ্মাবতী চলচ্চিত্রের দুটি দৃশ্যে রানি পদ্মিনী চরিত্রকে ইচ্ছাকৃত ভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে। এই দুটি দৃশ্যের ভিতর একটি নাচের দৃশ্য এবং অপরটি আলাউদ্দিন খলজি এবং রানি পদ্মিনীর স্বপ্নদৃশ্য। কর্ণি সেনা ও রাজস্থানের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অভিযোগ—এই দুটি দৃশ্য মহারানির চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে। ইতিমধ্যেই কোনও কোনও ব্যক্তি চলচ্চিত্র পরিচালক বনসালি এবং চলচ্চিত্রের মূল চরিত্রাভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে হুমকি দিয়েছেন। নাক কাটার হুমকি, মাথার দাম ঘোষণা ইত্যাদিও হয়েছে। আবার এসবের পালটা একটি মহল বলতে শুরু করেছে—বাক্ স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এই অংশের অভিযোগের তির কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং সংঘ পরিবারের প্রতি। কিছু জায়গায় ভাঙচুর ইত্যাদির ঘটনাও ঘটেছে। সম্প্রতি নাহারগড় দুর্গে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার পদ্মাবতী বিতর্কে নতুন রহস্যও যোগ করেছে। এমতাবস্থায় আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় এবং রাজপুত ভাবাবেগে আঘাত করছে এই অভিযোগে গুজরাট-সহ বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য সরকার এই ছবি স্ব স্ব রাজ্যে দেখানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বনসালি পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়নি। শেষ পর্যন্ত এই চলচ্চিত্রটির কোনও অংশ ছাঁটকাট করা হবে, কি হবে না—তা সেন্সর বোর্ডই ঠিক করবে। তবে, এটুকু বলাই যায়—এই চলচ্চিত্রটিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক কালে যেরকম বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে—তেমন বিতর্ক বহু চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। এই বিতর্ক কবে শেষ হবে, কোথায় শেষ হবে—তা এখনও অজানা।

এই লেখাটি সঞ্জয় লীলা বনসালি পরিচালিত পদ্মাবতী সিনেমার আলোচনা নয়। এই চলচ্চিত্রে রানি পদ্মিনীর চরিত্রকে কতখানি কলঙ্কিত করা হয়েছে—আলোচনা তা নিয়েও নয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতটি একটু অন্য। পদ্মাবতী চলচ্চিত্রটিকে কেন্দ্র করে যেভাবে কর্ণি সেনার মতো একটি

সংগঠন, রাজস্থানের ক্ষত্রিয় এবং তদুপরি হিন্দু সমাজের এক বৃহৎ অংশ ক্ষুব্ধ এবং আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে—তার প্রকৃত কারণ কী? শুধুই কি একটি চলচ্চিত্রে রানি পদ্মিনী চরিত্রের অবমাননা, নাকি দীর্ঘদিনের সঞ্চিত এক ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ? পাঠকদের মনে আছে নিশ্চয়ই—বছর দুয়েক আগে, হিন্দু বাঙালির শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব, দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল উগ্র বাম ছাত্রছাত্রী দেবী দুর্গা সম্পর্কে অশ্লীল এবং জঘন্য মন্তব্য করতে শুরু করেছিল। হিন্দুদের আরাধ্য এই দেবীকে 'বেশ্যা' আখ্যা দিতেও তারা দ্বিধা করেনি। দেবী দুর্গা সম্পর্কে এই অশ্লীল কুৎসিত মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগের ওপর সেই সময় যথেষ্ট আঘাত হানা হয়েছিল। মজার ব্যাপার, ওই একবারেই কিন্তু তারা ক্ষান্ত হয়নি। এবছরও দুর্গোৎসবের ঠিক প্রাক্কালে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবী দুর্গা সম্পর্কে আবার একই ধরনের অশ্লীল মন্তব্য প্রচার করা হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে—এই আচরণটি কি বাক্ স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে? বাক স্বাধীনতার অর্থ কি এই যে, অন্য এক ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় এবং সামাজিক আবেগকে বারবার আঘাত করা? পদ্মাবতী চলচ্চিত্রটিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের ঘটনাকে যাঁরা আজ বাক্ স্বাধীনতা হরণ বলে দেখাতে চাইছেন—যাঁরা প্রচার করছেন এর পিছনে সংঘ পরিবারের সমর্থন রয়েছে—তাঁরা হিন্দু বাঙালির ধর্মীয় আবেগে আঘাত পড়লে মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন কেন? নাকি, তাঁরা মনে করেন—হিন্দুর ধর্মীয় আবেগটা আঘাত করার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (সেকুলার, হি হি!) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁর রাজ্যে পদ্মাবতী প্রদর্শিত হবে। অথচ কয়েকমাস আগে এই রাজ্যেই 'জুলফিকর' নামক একটি চলচ্চিত্রের বেশ কয়েকটি দৃশ্য কাটছাঁট করা হয়েছিল এই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই। কারণ, 'জুলফিকর' চলচ্চিত্রের কয়েকটি অংশ নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন কয়েকজন

মুসলিম ধর্মগুরু। ওই জুলফিকর চলচ্চিত্রেরই এক চরিত্রাভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—পদ্মাবতীকে নিষিদ্ধ করলে তা হবে শিল্পের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসেনজিৎবাবুর কাছে জানতে ইচ্ছে করে—সেকুলারিজমের অর্থটি কী? হিন্দুর আবেগে আঘাত করা এবং মুসলমান ধর্মগুরুদের সামনে নতজানু হওয়া?

ভাবুন তো একবার—দেবী দুর্গাকে যেভাবে বিকৃত করা হল—ঠিক সেভাবেই যদি অন্য কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্য কোনও ধর্ম প্রচারক সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করা হত? মেনে নিতেন সেই ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষরা? অন্য ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি নিছক গুজবকে কেন্দ্র করে কী হতে পারে—সে তো এই রাজ্যেরই কালিয়াচক প্রত্যক্ষ করেছে। তসলিমা নাসরিনকে কেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত হতে হল, কেন আর পশ্চিমবাঙ্গে আসার অনুমতি তিনি পান না—সে তো সকলেরই জানা। জয়পুরের কর্ণি সেনা যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তার থেকে সহস্রগুণ বেশি হিংসাত্মক আক্রমণ কিন্তু এই 'অন্য ধর্মের' মানুষরা অনেক আগেই দেখিয়ে রেখেছে। পদ্মাবতী প্রসঙ্গে যাঁরা 'বাক্-স্বাধীনতার' দাবিতে বাজার গরম করছেন, তাঁদের প্রশ্ন, তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে আপনারা চুপ কেন? কেন আপনারা বুক ঠুকে বলতে পারেন না, সলমন রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস গ্রন্থটির ওপর থেকে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক? কেন আপনারা বলতে পারছেন না, সুলতানা রিজিয়া নিয়েও পদ্মাবতীর মতো একটি চলচ্চিত্র হোক। সেক্ষেত্রেও কোনও বিক্ষোভকে আপনারা প্রশ্রয় দেবেন না। হিন্দুদের দেবদেবী এবং ধর্মীয়-সামাজিক আচরণ নিয়ে নানাবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও নিম্নরুচির আক্রমণ দীর্ঘদিন থেকেই এই দেশে প্রচলিত। হিন্দু মন্দিরে বলি প্রথার বিরুদ্ধে যাঁরা সরব, তাঁরা কিন্তু মুসলমানের কুরবানি নিয়ে টু শব্দটিও করেন না। প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর আগে একজন অতি বিপ্লবী বাজার গরম করে বলতে শুরু করেন—এই

দুর্গাপূজা নেহাতই অর্থের অপচয়। এঁরা জানেন না, হিন্দু বাঙালির এই সর্বজনীন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সারা বছর অনেকগুলি পেশার মানুষের সংসার চলে। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর কাছে যে গ্রন্থটি সর্বজনগ্রাহ্য বলে চিহ্নিত হয়, সেই গ্রন্থটির নাম শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা। এই গীতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—'মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সে চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা।' ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থটি সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ করে আসা হয়েছে। হিন্দু দেবীর নগ্ন চিত্র অঙ্কন বা প্রকাশ্য রাজপথে গোমাংস ভক্ষণ করে হিন্দু ভাবাবেগকে ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করা হয়েছে। তখন কোথাও কোনও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। এই বাজারে সেকুলার বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা কখনও বলেননি—হিন্দুর ধর্মীয় এবং সাামাজিক আবেগকে আঘাত করাও অন্যায়। বলেননি বলেই সন্দেহ জাগে, এঁরা প্রকৃত অর্থেই সেকুলার; নাকি সেকুলারিজমের আড়ালে হিন্দু-বিরোধী।

পদ্মাবতী চলচ্চিত্রটি কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ আজ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—তার বীজ নিহিত আছে কিন্তু এদেশের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা হিন্দুদের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং অবমাননার মানসিকতার ভিতরে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলির মাথায় এতদিন ধরে ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছেন নেহরুপন্থী এবং বামপন্থী শিক্ষাবিদ্‌রা—তাঁরাই খুব সুকৌশলে হিন্দু ধর্ম -হিন্দু সংস্কৃতি-হিন্দুর ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, আর তাঁদের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেই—বাক্-স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে বাজার মাত করতে নেমেছেন। বাক্ স্বাধীনতা শুধু তাঁরাই ভোগ করবেন—আর দশকের পর দশক হিন্দুরা শুধু অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবেন—এটাই বা কোন যুক্তিপূর্ণ কথা?

এতদিন ধরে যে ক্ষোভ হিন্দুর বুকে জমা হয়েছিল—সেটিই আজ

পদ্মাবতীর প্রতিবাদে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। একে শুধু উগ্র হিন্দুত্ববাদীর আস্ফালন বা সংঘ পরিবারের রাজনীতি হিসাবে খাটো করে দেখলে হবে না। জাতি হিসাবে হিন্দু বরাবরই সহিষ্ণু। সহিষ্ণু বলেই হিন্দু নৃপতিরা কখনও পেশি শক্তির জোরে অন্য রাষ্ট্র দখল করতে যাননি। হিন্দু ধর্ম বরাবরই শান্তি এবং সৌভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছে বিশ্বে। তরবারির শাসনে সে ধর্ম প্রচার করতে অন্য দেশে যায়নি। সহিষ্ণু বলেই, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কখনও বিতাড়িত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেয়নি। হিন্দু সহিষ্ণু বলেই এতবছর ধরে তার ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর এই আঘাত নীরবে সহ্য করে এসেছে। যাঁরা এই আঘাত করেছেন, তাঁরা এখানেই ভুল করছেন। হিন্দুর সহিষ্ণুতাকে তাঁরা হিন্দুর দৌর্বল্য ভেবে এসেছেন। তাঁরা মনে করেছেন—একের পর এক আঘাতে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে জর্জরিত করব এবং সেকুলার নাম কিনে বাজার মাত করব। বুঝতেই পারেননি, ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলতে শুরু করেছে হিন্দু হৃদয়ে। এই আগুন যে একদিন দাবানলের মতো আত্মপ্রকাশ করবে তা বুঝতেও চাননি।

পদ্মাবতী বিতর্কের হয়তো একদিন অবসান হবে। কিন্তু হিন্দু হৃদয়ের এই ক্ষোভের আগুন নিভবে কি? আজ পদ্মাবতী নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছে, কাল যে হিন্দু হৃদয় অন্য কোনও প্রসঙ্গে আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে না—তার কি নিশ্চয়তা আছে? ভারতের হিন্দু নিশ্চয়ই চিরকাল অপমানিত, লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। লাঞ্ছিত হতে হতে একদিন তো সে প্রতিবাদ করবেই। আর সে ক্ষোভের প্রকাশ হয়তো সবসময় খুব শান্তিপূর্ণ পথেও হবে না।

যাঁরা প্রতিনিয়ত হিন্দুর ধর্মীয় এবং সামাজিক আবেগকে আঘাত করছেন এবং তারপর প্রত্যাঘাত হলেই বাক্ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ধুয়ো তুলছেন—তাঁদেরও বুঝতে হবে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আবেগে

আঘাত করাটা অন্যায় কাজ। অন্যের ধর্মাচরণ, অন্যের ঐতিহ্য, অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান না জানালে—নিজের সম্মানও অর্জন করা যায় না। যে-পদ্মাবতী চলচ্চিত্রটিকে ঘিরে এক বিতর্ক শুরু হয়েছে, বুঝতে হবে সেই রানি পদ্মিনী এক বিশাল সংখ্যক হিন্দু ভারতীয়ের কাছে প্রায় দেবীর সম্মানে পূজিতা হয়ে থাকেন। সেই আবেগকে কোনও ভাবে আঘাত করা কিন্তু কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্ম হতে পারে না। যাঁরা দিনের পর দিন এভাবে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি সমাজব্যবস্থা ঐতিহ্যের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত হানছেন—তাঁদের দায়িত্ববোধ নিয়েও তো প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে—আসলে কাদের প্ররোচনায়, কাদের মদতে তাঁরা এ-কাজ করছেন? প্রশ্ন আরও উঠবে—কারণ ইতিমধ্যেই সঞ্জয় লীলা বনসালির এই চলচ্চিত্রটির পক্ষে সওয়াল করতে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন দাউদ ইব্রাহিম!

হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'জগতে যতটুকু পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাবের প্রতি সহানুভূতি আছে, কার্যত তাহা এখানেই এই আর্যভূমিতেই বিদ্যমান। অপর কোথাও নাই। কেবল এখানেই হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রিস্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্য কোনো দেশে গিয়া মুসলমানদিককে বা অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিবে তাহারা কি রূপ সাহায্য করে? তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমায় দেহমন্দিরটিও ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন—ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনো এই পরধর্মসহিষ্ণুতা, শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা/৫ম খণ্ড)

তাই, অনুরোধ, হিন্দুর প্রতি অসহিষ্ণুতা বন্ধ করুন।

বাংলার নবজাগরণে পদ্মিনী উপাখ্যান

ড. জিষ্ণু বসু

আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লির নিষ্ঠুরতম পাঠান সুলতান। নিজের চাচা জালালুদ্দিন খিলজিকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দিন চাচা জালালুদ্দিনের মেয়েকেই বিয়ে করেন। মালিকা-ই-জাহানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরেই আলাউদ্দিন বোঝেন যে বিবাহের পবিত্র বন্ধন তার জন্য নয়। বছরখানেকের মধ্যেই মাহ্রু নামের একটি মেয়েকে তার স্ত্রীর সামনেই উপভোগ করেন। যোড়শ শতকের ঐতিহাসিক ফারিস্তার মতে আলাউদ্দিনের এই ধরনের নোংরা জীবনযাত্রা পাঠানদের মতো পার্বত্য উপজাতিদের কাছেও অসহ্য ছিল। তাই স্ত্রী মালিকা ও শাশুড়ি সুলতান জালালুদ্দিনের কাছে অভিযোগ করেন। চতুর আলাউদ্দিন নিজের স্বতন্ত্র রাজত্ব স্থাপনের অভিপ্রায়ে বেরিয়ে পড়েন। আলাউদ্দিনের উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের সামস্যাবহুল কাহিনি হাজি-উদ-দাবির লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

রাজ্য জয়ে বের হয়ে প্রথমে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্য দখল করেন আলাউদ্দিন। দাক্ষিণাত্যের মানুষ প্রথম জীবন্ত নরপিশাচকে দেখল। সোনা-দানা, ধনরত্ন, হাতি, ঘোড়া তো বটেই বিজিত রাজ্যের মেয়েদেরও যে পণ্যের মতো নিয়ে যাওয়া যায় সেই বীভৎসতা প্রথম প্রত্যক্ষ করল দেবগিরি। সালটা কমবেশি ১২৯৬। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের কাছ থেকে আলাউদ্দিন কেড়ে নিলেন তার আদরের কন্যা ঝাত্যাপালিকে। সেই শুরু।

এরপর একের পর এক হিন্দু রাজ্য দখলের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কশায়িনী করেছেন সেখানকার রাজপরিবারের মেয়েদের। সে রাজকন্যা ঝাত্যাপালিই হোন আর গুজরাটের রাজবধূ কমলাই হোন। তার হারেম সর্বদা সুন্দরী যুবতী নারীতে পূর্ণ থাকলেও আলাউদ্দিনের যৌনতৃষ্ণা কখনো মেটেনি। দেবগিরির রাজকন্যাকে ভোগ করে রাজ্যের প্রভূত ধনরত্ন, মূল্যবান ধাতু, দাসি রত্ন, রেশমের বস্ত্রাদি, হাতি আর ঘোড়া নিয়ে যখন আলাউদ্দিন কারার দিকে রওনা হলেন তখন সেই লুঠের গনিমতের মালের সঙ্গে শিকলে বাঁধা সারি সারি হিন্দু যুবতীও ছিল। সেই গনিমতের মালের ভাগ পেতে সুলতান জালাউদ্দিন গোয়ালিয়র পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিন সে পথে পা বাড়ালেন না। তিনি লুঠের সব মাল নিয়ে কারাতে চলে গেলেন। কারাতে পৌঁছে ধূর্ত আলাউদ্দিন মোক্ষম চাল দিলেন। তিনি সুলতানের কাছে ক্ষমা চেয়ে পত্র লিখলেন। জালাউদ্দিন ক্ষমা করে তৎক্ষণাৎ পত্র পাঠালেন। জালাউদ্দিনের দূত কারাতে এসে আলাউদ্দিনের সৈন্য সম্ভার দেখে বুঝল শয়তানের আসল পরিকল্পনা। কিন্তু আলাউদ্দিন তাদের আর ফিরতে দিলেন না। কারাতেই আটকে রাখলেন। বরং ভাই আলমাস বেগকে (উল্লুহ্ খান) পাঠিয়ে জালাউদ্দিনকে ভুল বুঝিয়ে কারাতে নিয়ে এলেন। কারাতে ঢোকার ঠিক মুখে ১২৯৬ সালের ২০ জুলাই গঙ্গাবক্ষে জালালুদ্দিনকে অভ্যর্থনার ভান করে খুন করলেন আলাউদ্দিন। জালালুদ্দিনের সেই ছিন্ন মস্তক একটি বল্লমের মাথায় গেঁথে তার সারা শিবির ঘোরালেন আলাউদ্দিন, তারপর আওধে পাঠিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিক বাণারসী প্রসাদ সাকসেনা তার 'এ কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া : দ্য দিল্লি সুলতানেত' গ্রন্থে এমনই এক পাশবিক চরিত্রের মানুষ রূপে দেখিয়েছেন আলাউদ্দিন খিলজিকে।

মজার ব্যাপার হলো, আলাউদ্দিনের মৃত্যুর ২২৪ বছর পরে সুফি কবি মালিক মহম্মদ জাইসি তাকে এক অসাধারণ রোমান্টিক নায়করূপে দেখিয়ে

কাব্যগ্রন্থ লিখলেন। 'পদ্মাবত' কাব্যের পটভূমি রাজস্থানের চিতোর এবং সময়কাল আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের বছর। জাইসি চিতোরের লোক নন, রাজস্থানেও কখনো থাকেননি। জাইসির কবর আমেথিতে। তাই স্থানীয় লোককথা শুনে তিনি 'পদ্মাবত' লিখেছেন, এমন সুযোগও নেই। তাই জাইসির লেখা সম্পূর্ণ দূর থেকে শোনা বহুপুরাতন এক কাহিনির উপর তৈরি এক কষ্টকল্পনা। সুফি কবি বা সুফি নাম শুনলেই অনেকের মনে এক ভ্রান্ত ছবি ভাসে। মানবতাবাদী, উদারপন্থী, দয়ালু, পরমতসহিষ্ণু এক সন্ত ফকিরের চেহারা। সব সুফি মোটেই এমন ছিলেন না। বাংলার মানুষ দুই সুফির কীর্তি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছে, শিক্ষা নিয়েছে। সিলেটের শেষ হিন্দু রাজা গৌরগোবিন্দকে অন্যায় ভাবে পরাস্ত ও হত্যা করার চক্রান্ত একা এক সুফি ফকির শাহ্ জালালের। খ্রিস্টীয় ১৩০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সিলেটে আসেন তিনি। সদা সহিষ্ণু হিন্দু সমাজ, প্রজাবৎসল রাজা গৌরগোবিন্দ সুদূর আরবদেশের ইয়েমেন থেকে আসা এই ফকিরকে সরল মনে থাকতে দিয়েছিলেন, ডেরা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সুরমা নদীর ধার থেকে অতি গোপন পথ দিয়ে আক্রমণকারী সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহকে এনে তার আশ্রয়দাতা গৌরগোবিন্দকে পরাস্ত করান এই সুফি ফকির। আরেক সুফি ছিলেন পরাধীন ভারতের ভয়ঙ্করতম নরহত্যার নায়ক হুসেন সইদ সুরাবর্দি। ১৯৪৬ সালের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর কথা আজ সারা পৃথিবীর নরহত্যার বীভৎসতম ইতিহাস হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অখণ্ড বাংলার এই জল্লাদ প্রধানমন্ত্রীও সুরাবর্দিয়া মহজবের সুফি। তাই মালিক মহম্মদ জাইসির লেখাকে কোনো মহাত্মা সুফি সন্তের ঐশ্বরিক ব্যাখ্যান হিসেবে কোনো বঙ্গভাষী বিদ্বজ্জন মনে করবেন না।

১৬৬৯ সাল নাগাদ ফরিদপুরের সইদ আলাউল জাইসির 'পদ্মাবত' কাব্যের বাংলা ভাবানুবাদ করেন। কাব্যগ্রন্থের নাম দেন পদ্মাবতী। আধুনিক সমালোচকদের মতে আলাউলের রচনা জাইসির মতো এতো উগ্র ধর্মনির্ভর

ছিল না, বরং অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ আর মানবিক। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ২০১৪ সালে 'আলাউল' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেছে। লেখক ওয়াকিল আহমেদ। আহমেদ সাহেবের মতে জাইসির 'পদ্মাবত' ধর্মীয় অতিলৌকিকতা ও সুফিতত্ত্বে ভরা, সেই তুলনায় আলাউলের কাব্য হলো ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক ভালোবাসার উপাখ্যান। তাই ওই অত যুগ আগেও জাইসির বক্তব্য বা মতকে বাংলার মানুষ সহজ সত্য বলে মেনে নেয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাজস্থানকে ভালোবেসে ফেললেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিক এক প্রাচ্যবিদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেমস টড। তিনি ১৭৯৯ সালে ইংল্যান্ড ছেড়ে বেঙ্গল আর্মির অফিসার হলেন। ধীরে ধীরে এই মানুষটি এক সংবেদনশীল ভারতবিদ হয়ে উঠলেন। রাজস্থানের দুর্গে দুর্গে, জনপদে জনপদে ঘুরে ঘুরে, লোকগাথা শুনে বুঝে তিনি তৈরি করলেন এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই কাজে তাঁকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন তার জৈন গুরু জ্যোতি জ্ঞানানন্দ। ১৮২৯ সালে লন্ডনের রওটেল্ডার অ্যান্ড কেগান পল লি. থেকে প্রকাশিত হলো টডের অসাধারণ ঐতিহাসিক দলিল, 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকস অব রাজস্থান'। বিভিন্ন রাজবংশ, বিভিন্ন রাজত্বের উত্থান-পতনের গাথার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের প্রসঙ্গ এসেছে। টড এড়িয়ে যাননি রানি পদ্মাবতীর প্রসঙ্গও। অসাধারণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন রানি পদ্মিনীর (পদ্মাবতীর অন্য নাম) মানসিকতা ও আক্রমণকারীদের বীভৎসতা : "তাতারদের লালসা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে অপরূপা সুন্দরী পদ্মিনীকে ঘিরে সমবেত হলো যত পুরনারী। রানি তাদের নিয়ে মাটির নীচে এক গুহার মতো স্থানে প্রবেশ করলেন। বন্ধ করে দেওয়া হলো সেই প্রকষ্ঠের দ্বার। ওই বীভৎস ক্ষুধার্ত নারীলোলুপ আক্রমকদের হাতে অপমানিতা ধর্ষিতা হওয়ার থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ছিল সেটাই।"

জেমস টডের এই লেখা সেযুগের শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৫ সালে সদ্য প্রকাশিত এডুকেশন গেজেটের সহ-সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন রঙ্গলাল। মাসিক পত্রিকা রসসাগর প্রকাশ শুরু করলেন তিনি, পরে তার নাম হলো সংবাদ সাগর। পরবর্তীকালে একটি সাপ্তাহিক পত্র 'বার্তাবহ'ও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। জেমস টডের রাজস্থানের গাথা তাকে স্পর্শ করেছিল। সেই প্রেরণা থেকেই তিনি 'পদ্মাবতী উপাখ্যান' লিখলেন। বইয়ের প্রচ্ছদে লেখা হলো 'রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ'। রঙ্গলাল ভূমিকায় বলেছেন, 'আমি উভয়োক্ত মহাত্মার অনুরোধে কর্নেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে উপাখ্যানটি নির্ব্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম।' পদ্মিনীর মানসিকতা, সৎগুণ এবং অত্যাচারী আলাউদ্দিনের প্রতি তার মনোভাব অকপটে বর্ণনা করেছেন রঙ্গলাল, পদ্মিনীকে একবার দেখতে চেয়েছেন আলাউদ্দিন।

"সাধ্বী সতী পতিব্রতা অতি গুণবতী
একথা তাহারে কবে কোন মূঢ়মতি।"

অথবা পদ্মিনী প্রদর্শনের এই অংশটি,

"পদ্মিনী সুশীলা সতী, পতিব্রতা, পুণ্যবতী
অকলঙ্ক শশী ক্ষত্রকুলে
অতি ধন মনে মনে গনি
পতিরূপ ধনে ধনী ধনি।"

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পদ্মাবতীর মাধ্যমে তিনি দেশাত্মবোধ জাগরণের চেষ্টা করেছেন। তার পদ্মিনী ক্রমে হয়ে উঠেছেন দেশের জন্য ত্যাগ, স্বাভিমান আর সম্মানের প্রতীক। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' বিখ্যাত দুটি পঙক্তি—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

এই অসাধারণ পঙক্তি দুটি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মনে বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। আলাউদ্দিনের নিষ্ঠুরতার কাছে আপোশহীন ভাবে পদ্মিনীর সম্মান, ইজ্জত ও মর্যাদার লড়াইকে সে যুগের দেশপ্রেমিকরা বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত একজন আই সি এস ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে সরকারি কাজ থেকে অবসর নেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ানো শুরু করেন। সেই সময় অর্থনৈতিক রাষ্ট্রবাদের উপর তার বিখ্যাত পিএইচডি থিসিস প্রকাশিত হয়। সম্ভবত দেশপ্রেম থেকেই রমেশচন্দ্র বাংলাভাষাতে লেখা শুরু করেন। পরে রামায়ণ, মহাভারতেরও অনুবাদ করেন। তার লেখা প্রথম পুস্তক 'মাধবীকঙ্কন' তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। তার মুখবন্ধে লেখেন :

"প্রিয় সুহৃৎ সুরেন্দ্র,

নয় বৎসর গত হইল, তুমি, সুহৃদবর বিহারীলাল ও আমি এই তিনজনে একদিন প্রাতঃকালে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া একত্রে, একই উদ্দেশ্যে বহু সমুদ্র পার বিদেশ-যাত্রা করিয়াছিলাম। ...অদ্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন কার্যে ব্রতী হইয়াছি। তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। সেই মহৎ কার্যে সফল হও। এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।"

বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করেছেন। বাংলায় প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল

ইতিহাস লিখলে দেশাত্মবোধ জাগরিত হবে, সেটাই হয়তো ছিল রমেশচন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' নামে দুটি অসাধারণ গ্রন্থ লেখেন। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় স্বাভাবিক ভাবে এসেছে আলাউদ্দিনের কথা, তার অত্যাচারের কাহিনি :

"প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোর শিশোদিয়ার কণ্ঠমণি চিতোর তুর্কি হস্তে কতদিন থাকে? সেবার হাম্বির এই কণ্ঠরত্ন তুর্কিদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। এবার প্রতাপ সিংহ লইবেন।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছদে 'ভীমগড় ধ্বংসের' বর্ণনাতে তিনি জহরব্রতের বেদনাবিধুর চিত্র তুলে ধরেছেন :

"পরে অন্যান্য রমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্যবদনে কহিলেন— সখীগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামী সোহাগিনী হইব। ইহা অপেক্ষা রাজপুত কামিনীর অদৃষ্টে কী সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কিগণ দেখুক। রাজপুত যোদ্ধৃগণ বীর, রাজপুত রমণীগণ সতী।"

"নবোদিত সূর্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন। দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর? তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম অনুসারে অলঙ্কার- বিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্মনাশ অনিবার্য হয়, রাজপুত রমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'কথা ও কাহিনি' কাব্যগ্রন্থে একটি অসামান্য কবিতা সংযোজন করেন। কবিতার নাম 'হোরি খেলা'। কবিতার মুখ্য চরিত্রগুলির নাম অবশ্য এক পাঠান সুলতান কেশর খান এবং কেতুনগড়ের রাজা ভূনাগের রাজ্ঞী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিতার স্থান রাজস্থান

বললেও ঘটনাটি আলাউদ্দিন ও পদ্মিনীর ঘটনার খুব কাছাকাছি। কবি এখানে পদ্মিনীকে কিছুটা সুবিচার, পরিভাষায় বললে 'পোয়েটিক জাস্টিস' পাইয়ে দিয়েছেন। এখানে রানি রাজপুতানীর পোশাকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের নিয়ে গিয়েছিলেন পাঠানপতির সঙ্গে হোলি খেলতে। এমনই ছলনার শেষে হঠাৎ রানি তার হাতের ভারী কাঁসার থালাটি সুলতানের চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। কবিগুরুর ভাষায়, "পাঠানপতির ললাটে সহসা/ মারেন রানি কাঁসার থালাখানা। রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে/ পাঠানপতির চক্ষু কানা।।" কবিতার শেষ লাইন দুটি খুবই অর্থবহ, "যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল। সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'রাঙাকাকা' রবিঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা যেন অনেকটাই সঞ্চারিত হয়েছিল অবন ঠাকুরের মধ্যে। তিনি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর মতো যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। চিত্রকলাতে স্বদেশী ভাবনা এনে বলিষ্ঠ ঘরানা তৈরি করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির এই মনীষী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে প্রথম ভারতমাতার চিত্র আঁকলেন। গৈরিকবসনা হিন্দু দেবী। এক হাতে ধানগাছ, একহাতে মালা, একহাতে বেদাদি গ্রন্থ আর অন্যটিতে জপমালা। এই চিত্র দেখে অভিভূত হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা চেয়েছিলেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী গ্রামে-শহরে সর্বত্র দেখানো হোক এই ভারতমাতার রূপ। যদি জাগরিত হয় সুপ্ত দেশ। অবন ঠাকুর এক অসাধারণ কথাসাহিত্যিকও ছিলেন। বিশেষত শিশু সাহিত্যে। নালক, বুড়ো আংলা, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল একেকটি যেন লাবণ্যের খনি। সেযুগে সমালোচকরা বলতেন অবন ঠাকুর 'গল্প লেখেন না গল্প আঁকেন।' অবন ঠাকুরের আর একটি কালজয়ী গ্রন্থ রাজকাহিনি। রাজস্থানের রাজপুতদের গাথা। এই রাজকাহিনির একটি হলো পদ্মিনী। নারী লোলুপ আলাউদ্দিনের কামনার আগুনে জল ঢেলে দিয়েছিল রাজপুত স্বাভিমান। একজন নারীর

জন্য একটা জাতি যে নিজেদের শেষ করে দিতে পারে সেটি পাঠান সুলতানের ধারণায় ছিল না। অবন ঠাকুরের ভাষায়, "আল্লাউদ্দিন ভেবেছিলেন— যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব, কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিকে যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারদিকে দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব। পাঠান বাদশা পাহাড়ের নীচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।"

রানির সঙ্গে রাজপুত সর্দারদের পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক অপরূপ ছবি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। রাজপুত সর্দারদের বৈঠকে সর্বসম্মতি ভাবে ঠিক হলো যে কোনোমতেই ওই নরপিশাচের হাতে পদ্মিনীকে দেওয়া হবে না : "তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত-সর্দারের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান। পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নন, তিনি আমাদের রানিও বটে। কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীসুদ্ধ লোক বলবে রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রানার হয়ে লড়ে? ...রাজসভা ভঙ্গ হলো। সেই সময় রাজসভার এক পারে শ্বেতপাথরের জালির আড়াল থেকে সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লালা রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারদের মাঝে এসে পড়ল। সর্দারেরা পদ্মিনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে 'রানির জয়!' বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।" ঠিক তেমনই রানাকে আলাউদ্দিনের কারাগার থেকে ফিরিয়ে এনে সিংহদ্বারের যুদ্ধে যখন প্রাণ দিলেন রানা-রাজ্ঞীর একান্ত অনুগত সর্দার গোরা, সেই দৃশ্যের বর্ণনা ও অসাধারণ বেদনাবিধুর।

"সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধশেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন। তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী

জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?'' রানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "পদ্মিনী, আজ আমার পরম উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মতো যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে দেবলোকে চলে গেছে। দুজনের আর একটিও কথা হলো না। রানি পদ্মিনী শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন, দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায়-হায়-হায়-হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।"

আলাউদ্দিনের নিষ্ঠুরতা বোঝাতে অবনীন্দ্রনাথ একটি অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন। "তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন। মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো এক জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপর একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন একটি পাখি ভয়ে চিৎকার করতে করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একটি প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতর ছটফট করছে। তিনি শিস দিয়ে বাজ-পাখিকে ফিরে ডাকলেন। পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল, আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা-পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন। আর সেই তোতাপাখির জোড়া পাখিটা প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে-ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল। শেষে ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি ছোট খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতীও এসে আপনি

ধরা দিয়েছে।' আলাউদ্দিন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে চলছিলেন, হঠাৎ ওমরাহোর মুখে ওই কথা শুনে তাঁর মনে হলো— যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রানি পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন!"

এই নিষ্ঠুর আলাউদ্দিনের প্রতি রানি পদ্মিনীর কী গভীর ঘৃণা ছিল তা আয়নাতে তার প্রতিবিম্ব দেখে নারীলোলুপ পাঠান সুলতানের ছুটে আসায় প্রকাশ পেয়েছে :

"রাগে রানির দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা, সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে ছুঁড়ে মারলেন— ঝনঝন শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আলাউদ্দিন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন।"

আলাউদ্দিন-পদ্মিনী প্রসঙ্গে আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম উপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা না বললে সম্পূর্ণ হবে না। সত্যসন্ধানী বোমকেশ চরিত্রের স্রষ্টা শরদিন্দু কিছু কালজয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। এরমধ্যে শঙ্খ-কঙ্কণ বহু প্রশংসিত একটি লেখা। শঙ্খ-কঙ্কণের প্রথম আবর্তের একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদের শুরুতেই লেখক আলাউদ্দিনকে চেনাচ্ছেন :

"দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দিন বেশিদূর অগ্রসর হন নাই। দেবগিরি রাজ্য ছলনার দ্বারা জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্বক স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তারপর পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে সুন্দরী যুবতীর অভাব ছিল না, তবু তিনি গুজরাটের রানি কমলাকে কাড়িয়া আনিয়া নিজের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন।

সুন্দরী নারী রাজরানী হোক বা পথের ভিখারিণী হোক, আলাউদ্দিনের চোখে পড়িলে আর তার নিস্তার নাই। তিনি একবার চিতোরের পদ্মিনীর দিকেও হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেই জ্বলন্ত অনলশিখাকে স্পর্শ করিতে

পারেন নাই। নারী-বিজয় ক্ষেত্রে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিনের ইহাই একমাত্র ব্যর্থতা।”

ভারতবর্ষের নবজাগরণের কাণ্ডারি ছিল বাংলা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবন ঠাকুর বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তারা পশ্চিমি যুক্তিবোধ দিয়ে স্বদেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, অতীতের লজ্জা দুঃখের কথা বলেছেন, যাতে সচেতন সমাজ একই ভুল আর না করে। দেবগিরির ঝাত্যাপালি কিংবা গুজরাটের রানি কমলা বাধ্য হয়েই আলাউদ্দিনের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। কেউই তাকে ভালোবাসেননি। আলাউদ্দিন-পদ্মিনীর রোমান্টিক কাব্যকাহিনি লিখে মালিক-মহম্মদ জাইসি হিন্দুদের কলঙ্কজনক পরাজয়, অপমানের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে চেয়েছিলেন। আজ আলাউদ্দিন-পদ্মিনীকে নিয়ে ছায়াছবি করতে হলে সেটা স্টিভেন স্পিলবার্গের স্লিন্ড্লার্স লিস্টের মতো নরসংহারের চলচ্চিত্র তৈরি করতে হবে সেটা কোনো মতেই রোমান্টিক ছবি হবে না। এই সরল সত্যটা বুঝতে আমাদের প্রগতিশীল সুশীল সমাজের এত সময় লাগছে? ১৯৯৩ সালে স্টিভেন স্পিলবার্গ যখন ইহুদিদের ওপর নাৎসিদের অত্যাচারের ছবি বানালেন তখন তিনি হলিউডে খ্যাতির প্রায় শীর্ষে। কেউ খেয়ালই করেনি যে জস (১৯৭৫) বা ইটি দ্য এক্সট্রা টেরেস্টারিয়াল (১৯৮২)-এর মতো সব ছবির পরিচালক ভদ্রলোকটি আসলে একজন ইহুদি। যার মনের গভীরে ইহুদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন ওই প্রথিতযশা পরিচালককে এমন একটা মর্মবিদারক চলচ্চিত্র বানাতে প্রেরণা দিয়েছে। সারা পৃথিবী স্টিভেন স্পিলবার্গকে মনে রাখবে এক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে। আর ইহুদি সমাজ পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে মনে রাখবে তাদের অসীম দুঃখ-কাহিনি তিনি চলচ্চিত্রায়ন করেছেন বলে। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র জগতের দুর্ভাগ্য যে তা দাউদ ইব্রাহিমদের ডি-কোম্পানির

পেট্রোডলারের লোভ কাটিয়ে বের হতে পারল না। মুক্তমনের শিল্পীসত্তা নিয়ে নবজাগরণের যুগে বাংলার লেখক শিল্পীরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে পারলেন না। তাই আজকে পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা ডি-কোম্পানির পাপের টাকার মতো আরব সাগরের জলে কালের স্রোতে হারিয়ে যাবেন। কেউ স্টিভেন স্পিলবার্গ হয়ে থেকে যাবেন না।

মোদ্দা কথা বক্স অফিস, তার জন্য যে-কোনও কুকর্ম করা যায়

সন্দীপ চক্রবর্তী

পাঠক বলুন তো, কত জি.বি বুদ্ধি থাকলে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়? জানেন না তো, সঞ্জয় লীলা বনসালিকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি অনায়াসে বলে দেবেন। কিংবা, একদা সফল অধুনা রাজনীতির গলিঘুঁজিতে দাঁড়িয়ে মুরুব্বি ধরার ফাঁদ পাততে ব্যস্ত এরকম যে কোনও অভিনেতা, পরিচালক, লেখক. শিল্পী, গায়ককে জিজ্ঞাসা করুন, তারাও বলে দিতে পারবেন।

আসলে এটা একটা ধাঁধা। চাষি, কামার, ছুতোর, চাকুরে, ব্যবসায়ী সবাইকে চেনা যায় কিন্তু বুদ্ধিজীবীকে চেনা যায় না। ঠিক যেমন সঞ্জয় লীলা বনসালিকে এখন চেনা যাচ্ছে না। তিনি কী চান! পালা শুরু হবার আগেই পাঁচ সিকের গাওনা গেয়ে মেঠো দর্শককে টানতে চান নাকি ইতিহাস বিকৃত করে বিতর্ক উসকে দিয়ে সেই আগুনে গা সেঁকতে চান। তিনি চিতোরগড়ের রানি পদ্মাবতীকে নিয়ে একটি ছবি তৈরি করেছেন। ছবির শুটিং চলাকালীনই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে দুটি বিষয়। আলাউদ্দিন খিলজির একটি স্বপ্নদৃশ্য এবং পদ্মাবতী রূপী দীপিকা পাড়ুকোনের একটি নাচ। স্বপ্নদৃশ্য এমন একটি খুড়োর কল যেখানে স্রেফ স্বপ্নের দোহাই দিয়ে শালীনতাকে উপেক্ষা করা যায়। বলিউডের পরিচালকেরা এ ব্যাপারে কতটা প্রতিভাবান তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এক্ষেত্রে সুবিধে হলো সশরীরে উপস্থিত রয়েছেন আলাউদ্দিন খিলজি—

যার বিকৃতকামের অজস্র উদাহরণ তখনকার ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুতরাং যদি শালীনতা একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়ও পণ্যমনস্ক বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এরপরে আসছে নাচের প্রসঙ্গটি। স্বামী এবং শাশুড়ির মনোরঞ্জনের জন্য দাসী ও সখী পরিবৃত হয়ে পদ্মাবতীর একটি নাচের (সঙ্গে গান : 'ঘুমর ঘুমর...') দৃশ্য আছে ছবিতে। চিতোরগড়ের রাজপরিবারের অভিযোগ, রানির পক্ষে এভাবে নাচা সম্ভব নয়। দৃশ্যটি অতিরঞ্জিত এবং অবমাননাকর। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন কমল হাসান, শাহরুখ, সলমন, আমির-সহ বেশ কয়েকজন। বক্স অফিসের রাবড়ি সবাই খেতে চায়, তাই ওদের কথায় অবাক হয়ে লাভ নেই। কিন্তু প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। ওরা কি এমন কোনও মহিলাকে চেনেন যিনি দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ফেরা স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য নাচগান করেন? সাধারণ মহিলারা যা করার কথা ভাবতে পারেন না তা একজন রানি কীভাবে করতে পারেন? দাসীদের সঙ্গে নাচলে তার রানিত্ব আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? সঞ্জয় লীলা বনসালি জানিয়েছেন ছবিতে কোনও আপত্তিকর দৃশ্য নেই। ভালো কথা। তাহলে চিতোরগড়ের রাজপরিবার যখন অভিযোগ করল যে, তাদের যে চিত্রনাট্য দেখানো হয়েছিল ছবি সেই অনুযায়ী হয়নি, বাড়তি দৃশ্য যোগ করা হয়েছে, সঙ্গতকারণেই তারা নতুন চিত্রনাট্য দেখতে চাইলেন— কিন্তু দেখানো হলো না। বলা হলো, ছবির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে, এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ আপনি মেনে নিলেন যে অভিযোগ সত্যি। এমনকী, এও বলে দিলেন সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা সহমত হয়ে জানিয়েছেন, ছবিতে কোনও আপত্তিকর দৃশ্য নেই। পরে প্রসূন যোশী সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। তারা সহমত হওয়া তো দূর, ছবিটা তখনও দেখেনইনি। প্রশ্ন হলো, এই লুকোচুরি কেন বনসালিসাহেব? কী লুকোতে চাইছেন আপনি?

সঞ্জয় লীলা বনসালি এই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও, পাঠক, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। এই পরিচালক বিতর্ক ভালোবাসেন। বিতর্কই তার ক্ষমতার উৎস। স্মরণ করুন 'হাম দিল দে চুকে সনম' (অজয় দেবগন, সলমান খান, ঐশ্বর্যা রাই অভিনীত) ছবিটির কথা। পুরোটা না হলেও এই ছবির অনেকটাই মৈত্রেয়ী দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'ন হন্যতে'-র টুকলি। অথচ ছবির টাইটেলে মৈত্রেয়ী দেবীর নাম নেই। সামান্য একটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্যন্ত নয়। সেই সময় এই নিয়ে মৃদু বিতর্কের আঁচ তৈরি হয়েছিল। মৃদু কারণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এই সামান্য ব্যাপারে বড়ো একটা মাথা ঘামাননি। চলতা হ্যায় গোছের মানসিকতায় মেনে নিয়েছিলেন বরেণ্য লেখিকার অপমান। আর টলিউডের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এখনকার টলিউড তারকারা হিন্দি ছবিতে একটা পনেরো মিনিটের ফুটেজের জন্য যে কোনও অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে পারেন। তাই বনসালিকে চটানো যে কাজের কথা নয় সেটা বুঝতে ওদের দেরি হয়নি।

এরপর ব্ল্যাক (অমিতাভ বচ্চন রানি মুখার্জি অভিনীত)। ব্ল্যাক ছবিটি হেলেন কেলারের জীবনী অবলম্বনে তৈরি। হেলেন কেলারের জীবনকে কেন্দ্র করে হলিউডে একটি ছবি হয়েছিল। সিডনি শেলডন তার চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। বনসালির ব্ল্যাক হলিউডের ছবিটির শট বাই শট টুকলি। অথচ বনসালিসাহেব তার ছবির কোথাও এই তথ্যের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। কিন্তু তিনি উল্লেখ না করলেও কথাটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। বিতর্কও কম হয়নি। কিন্তু ততদিনে বিতর্কের মইয়ে চেপে বক্স অফিসের মহাসমুদ্র পেরিয়ে গেছেন বনসালি।

পাঠক স্মরণ করুন দেবদাসের কথা। পার্বতী এবং চন্দ্রমুখী একসঙ্গে গান গাইতে গাইতে নাচছে— এই দৃশ্য দেখলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বোধহয় ভিরমি খেতেন। কারণ পার্বতী এবং চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালোবাসলেও, দুজনের প্রেমের চরিত্র আলাদা। একজন জমিদার- গৃহিণী অন্যজন বাঈজী। শুধু বিশ শতকের প্রারম্ভে (যে সময়ে দেবদাস লেখা

হয়েছিল) কেন, এই একুশ শতকেও দুই মেরুর বাসিন্দা এরকম দুটি চরিত্রের পক্ষে একসঙ্গে নাচা সম্ভব নয়। নীতা অম্বানির পক্ষে কি সম্ভব কোনও অখ্যাত বারড্যান্সারের সঙ্গে নাচা? অথচ এই নাচটিই ছিল দেবদাস ছবির নিউক্লিয়াস। মাধুরী দীক্ষিত আর ঐশ্বর্যা রাইয়ের নাচ কি ছাড়া যায়? সে তাঁরা যতই চন্দ্রমুখী আর পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করুন। কী দরকার সাহিত্যিক সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার! বিশেষ করে যে লেখকের কপিরাইট চলে গেছে তার রচনা নিয়ে যথেচ্ছাচার করলে বলার তো কেউ নেই। দৈবাৎ যদি কেউ হৈচৈ করে তাহলে বাকস্বাধীনতার ধুয়ো তো রইলই।

বনসালির ঐতিহাসিক সিরিজেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বাজিরাও মাস্তানিতে মাস্তানি একজন নর্তকী। কাশীবাঈ বাজিরাওয়ের স্ত্রী। অথচ ছবিতে দুজনকে একসঙ্গে নাচতে দেখা গেছে। এটা নেহাতই বনসালির বক্স অফিসকে ঘায়েল করার ফর্মুলা। আপাতদৃষ্টিতে যে সমীকরণ অসম্ভব তাকেই একটা নাচগানের প্যাকেজে মুড়ে বাজারে ছেড়ে দাও, পাবলিক চেটেপুটে খাবে! তাতে যদি ইতিহাস বিকৃত হয় কিংবা মানুষের আবেগ দলিত হয়, বয়েই গেল। সুতরাং পদ্মাবতী ছবিতে রাজপুতরানি যে দাসী এবং সখী পরিবৃত হয়ে নাচবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটেছে। পদ্মাবতীর অনৈতিহাসিক চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে সারা দেশ যখন বিক্ষোভে শামিল, ঠিক সেই সময় বাঙালি ইতিহাসবিদ আদিত্য মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন পদ্মাবতী নাকি ঐতিহাসিক কোনও চরিত্র নয়। কারণ আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে ভারতে আসা আমির খসরু পদ্মাবতীর কথা কোথাও লেখেননি। এই নিবন্ধে পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

একথা ঠিক যে পদ্মাবতীর সময়ে রাজবংশের তথ্য সংরক্ষণের রীতি রাজপুতদের মধ্যে ছিল না। পদ্মাবতীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জইস লিখিত পদ্মাবত নামের একটি কবিতায়। সেখানে তিনি সর্দার রতন সিংহ (চিতোরের মহারানা) এবং রানি পদ্মাবতীকে নায়ক নায়িকা রূপে উপস্থাপিত

করেছেন। জইস নিজে মুসলমান হলেও আলাউদ্দিন খিলজি তার কাছে খলনায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্নেল জেমস টডের লেখাতেও পদ্মাবতীর উল্লেখ রয়েছে।

আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকালে সব থেকে বেশি জহরব্রত সংঘটিত হয়েছিল ভারতে। এর থেকে একটা কথা বলা যেতে পারে আলাউদ্দিন খিলজি নিজে এবং তার সৈন্যরা মেয়েদের ওপর অত্যাচারে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিল। চিতোর দুর্গের গাইড এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া দু'পক্ষেরই মত, মোট তিনটে জহরব্রত দুর্গে সংঘটিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথমটিতে অংশ নিয়েছিলেন রানি পদ্মাবতী। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই দুর্গের অন্য রাজপুতানিরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। গৌরীশংকর ওঝা লিখিত 'উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস' গ্রন্থেও আমরা রানি পদ্মাবতী এবং তাঁর জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জনের উল্লেখ পাই।

এছাড়া, সি.কে.এম ওয়াল্টারও তার অ্যাব্রিজড হিস্টরি অব রাজপুতানা গ্রন্থে আলাউদ্দিন খিলজির 'কতল চিতোরগড়' নামক সামরিক অভিযানের কথা লিখেছেন। যে অভিযানের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পদ্মাবতীকে চিতোর থেকে তুলে এনে দিল্লির হারেমে বন্দি করা। যে কারণে পদ্মাবতী জহরব্রতের মাধ্যমে আত্মাহুতি দেন। এখন প্রশ্ন হলো, আমির খসরু তাহলে কেন লিখলেন না? উত্তরটা খুবই সহজ। পদ্মাবতীর কথা লিখলে খিলজির কথাও লিখতে হতো। ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল তাতে। জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুতরাং পদ্মাবতী কাল্পনিক চরিত্র— এই যুক্তি ধোপে টিকবে না। তাছাড়া পদ্মাবতী ঐতিহাসিক চরিত্র, ভারতীয় মহিলাদের আব্রুর প্রতীক— এইসব কথা মাথায় রেখেই তো বক্স অফিসের অঙ্ক কষা হয়েছে। এখন চরিত্রটি হঠাৎ কাল্পনিক হয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবে। বনসালি কখনই সেটা চাইবেন না। কারণ বক্স অফিসের জন্য তিনি যে কোনও কুকর্ম করতে পারেন।

মহারানি পদ্মিনি—এক সমগ্র বিবেচন

ড. সুশীলা লড্ঢা

"মেওয়াড়ী মাটিকা কালজয়ী যশগান।
ইতিহাসি পন্নে পন্নে পর পদ্মিনি কা বলিদান।।
চিতোড় জৌহর জ্বালা কী ধরতী হৈ, স্বতন্ত্রতা কী দীবাণী,
টুট গই পর ঝুকি নহী, ইসকে চট্টানে তুফানী।।
চিতোড় ভূমি নে তীন বার জৌহর কী জ্বালা ধধকাই,
চিতোড় কী পটরানী পদ্মিনী, পহলে আগে আই।।"

জহর কী?

দীর্ঘ সময় ধরে আক্রমণকারীদের দ্বারা ঘেরা দুর্গে যখন খাদ্যাভাব ও জলাভাব হয়ে যায়, তখন বীর রমণীরা স্বপ্রেরণায় শোলো শৃঙ্গার করে জৌহর করতেন। স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শকে অমর করতে, নিজ ধর্ম, সম্মান এবং দেশের রক্ষার জন্য সমস্ত রানিকুল, মা বোনেরা, কন্যা সন্তানেরা পুত্র-বধূরা সবাই ধূ ধূ প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অগ্নি স্নান করে প্রাণ বিসর্জন করতেন, তাকেই 'জহর' বলা হয়। পরে দুর্গের সমস্ত যোদ্ধারা গৈরিক বসন পরে দুর্গের দ্বার উন্মোচন করে শত্রুর কুলের সংহার করতে করতে বীরের মতন প্রাণ ত্যাগ করতেন। এটাকে 'শাকা' বলা হয়। জহর এবং শাকা চিতোরের গরিমাময় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ড. নরেন্দ্র মিশ্র লিখেছেন—

"কায়র ক্যা জানে জৌহর কে,
বলিদানী অগ্নি আবমন কো।
ক্যা জানে সোচ নপুংসক কী
গর্বোন্বিত প্রাণ বিসর্জন কো।
ক্যা জানে লহু দাসতা কা
জৌহর ব্রত কী পরিভাষা কো।
সুবিধা ভোগী সমঝেংগে
মর মিটনে কী অভিলাষা কো।"

'তকরিখ জৈসলমির' এবং 'দ্বৈসলমির কী খ্যাত' অনুযায়ী ১২৭৬ সালে জৈসলমির ত্যাগ করার পরে সিরোহি অঞ্চলে জালোর রাজ্যের রাজ্যাধ্যক্ষ রাওয়ল পুনপাল। ওঁনার তিন রানী। তাদের এক জিলেন সিরোহির রাজকন্যা জামকংবর দেবড়ী। ইনি জামবতের দেওরী।

চৌহান রাজাদের অধীনে রাজস্থান সীমানার সংলগ্ন গুজরাতে অবস্থিত সিংহলওয়াড়া সম্ভাগের কন্যা ছিলেন। ওঁনার ভাই ছিলেন গোরা ও তার ছেলে বাদল ছিল ভাইপো। আবার গোরা ছিল মহারানী পদ্মিনির মামা আর বাদল মামাতো ভাই। রাদ্ধরি উম্মেদসিংহ রাঠোর তাঁর গ্রন্থ 'চিতোড় কে সূরমা' আর 'চিতোড়গড় কে শাকে'তে লিখেছেন যে পদ্মিনির বিবাহ মহারাওয়াল রতনসিংহ এর সাথে হয়েছিল। ড. রামচন্দ্র শুক্লও তাই বলেছেন। 'আইন ই আকবরি'তে ওই একই নাম দেওয়া আছে। অনেক ঐতিহাসিকরা মহারানি পদ্মিনি সংক্রান্ত বইগুলির রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে প্রধান হল—লব্ধোদয় রচিত 'পদ্মিনি চরিত', হেমরতন রচিত 'গোরা-বাদল-পদ্মিনি চৌপাই'। ডা. দশরথ শর্মা রচিত 'পদ্মিনি রানী এক বিবেচন' এবং 'রাজস্থান যুদ্ধ এজেজ', ডা. লক্ষ্ণণসিংহ রাঠোর রচিত 'দি জৌহর আফ পদ্মিনি', এটা সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। জায়েসি রচিত 'পদ্মাবত'এর ১৪ বছর পূর্বে বিপ্রমাদ ১৫৮৩তে গোওয়ালিয়রের কবি

নারায়ণদাসের দ্বারা হস্তলিখিত রচনা 'ছিতাই বার্তা'তে এ রকম বর্ণনা আছে—

যো কেলে দিল্লী কো ধনী, মৈঁ চিতোরে সুনী পদ্‌মিনী।
বাংধ্যো রতন সেন নে জাই তো গো বাদিল্ল তাহি ছড়াই।

এগুলো ছাড়া ও অনেক অজানা কবিগণ, চারণগণ, ভাটগণেরা গোরা-বাদল পদ্‌মিনি সংক্রান্ত রচনা লিখেছেন। পুরাতত্ত্বাচার্য মুনি জিন বিজয়জী অনেক গবেষণা আলেখ্য লিখেছেন। এগুলোতে উনি প্রতিস্থাপিত করেছেন যে রাওয়াল রতন সেন, মহারানী পদ্‌মিনি, গোরা, বাদল, রাঘব, চেতন, এলরা ঐতিহাসিক চরিত্র এবং পদ্‌মিনির জৌহরের কথা সত্য ঘটনা। বিখ্যাত রাষ্ট্রকবি মৈথিলিশরণ গুপ্ত বর্ণনা করেছেন—

"বিখ্যাত যে জৌহর যহাঁ কে,
আজ ভী হৈঁ লোক মেঁ,
হম মগ্ন হৈঁ উন পদ্‌মিনিযোঁ কী
দেবিযোঁ কে শোকমেঁ।
আর্য স্ত্রিয়াঁ নিজ ধর্ম পর
মরতী হুই ভরতী নহী,
সাধান্ত সর্ব সতিত্ব শিক্ষা
বিশ্ব মেঁ মিলতী নহী।"

এই ঐতিহাসিক সত্য কথা কবি রামধারী সিংহ দিনকরও লিখেছেন—

"কিতনী দ্রুপদা কে বাল খুলে,
কিতনী কলিযোঁ কা অন্ত হুওয়া
কহ হৃদয় খোল চিতোর যহাঁ
কিতনে দিন জ্বাল বসন্ত হুওয়া।

অনেক রাজস্থানী কবিজনেরা ও মহারানী পদ্‌মিনির জৌহরের মহিমা গেয়েছেন—

"রুন ঝুন করতী পদ্‌মিনী, ঝাংঝর রে ঝঁপকার।
ধম ধম করতী জুহরা, যাক দুমাধ আন।
দাগনে লাগিয়ো দেহ মেঁ, সৎ রো আক তোড়।
পদ্‌মিনী পলো উজকো, রাখ লিয়ো চিতোর।।"

অর্থাৎ মহারানী পদ্‌মিনি জৌহর করে নিজের গরিমা রক্ষা করলেন। সতীত্ব এর রক্ষা করলেন আর চিতোরগড়কে গৌরবান্বিত করলেন। এই ভাবে বর্তমানে বীর রসের কবি প. নরেন্দ্র মিশ্র এর কতকগুলো কবিতাতে, পদ্‌মিনি দ্বারা স্বাভিমান রক্ষার জন্য জৌহর করা, গোরা-বাদল এর শৌর্য গাথা, এবং আলাউদ্দীন খিলজীর সাথে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করতে করতে রাওয়াল রতনসিংহ দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করা, সমস্ত ঘটনাগুলোর উল্লেখ আছে—

"কেসরিয়া লাজ লূটনে কো, খিলজী নে হাথ বড়ায়া থা।
জল মরেন সে জ্যাদা পাবন, উস দিন কোই সংকল্পন থা।
জৌহর হি শেষ বচাথা বস, কোই ভী অওর বিকল্প না থা।
জৌহর কী জ্যোতি ন জলতী তো, সম্মান খাক মে মিল জাতা হে।
জব তক জীবিত হৈ বসুন্ধরা, জব তক গংগা মে পানী হৈ।"

আরও দুটি পঙ্‌ক্তি—

"ভারত ভূমি কী ধরতী পর, জব তক কবিতা কী বাণী হৈ।
তব তক পদ্‌মিনী কে জৌহর কী গাথা দুহরাই জায়েগী।
জো জ্বালায়োঁং সে লিখী সবিনাশী অমিট নিশানী হৈ।"

বিক্রমাব্দ ১৩৫৯, ৫ই মাঘ বুধবার দিন দেবারীতে স্থাপিত শিলালেখেতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে মহারাল রতনসিংহ ১৩০২ সালে চিতোরগড়ে রাজত্ব করেছিলেন।

উপরি উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থগুলোতে মহারানী পদ্‌মিনির কেবল অদ্ভুত সৌন্দর্যেরই বর্ণনা আছে তা না, উপরন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব- এর কতগুলো

অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যেরও উদাহরণসহ বর্ণনা আছে। বাস্তবিকই মহারানী পদ্মিনী এক বীরাঙ্গনা, বুদ্ধিমতী, স্বাভিমানী, আদর্শ পত্নী, যুদ্ধনীতিকার, কুশল নেতৃত্ব ক্ষমতা, পবিত্রতা, নির্ণয় ক্ষমতা, দূরদর্শী, সতীত্ব রক্ষা, এই সব গুণ সম্পন্ন বিদুষী ছিলেন। কিন্তু ই. সাল ১৫৪০এ ভক্তি কালের নির্গুণ ভক্তি ধারার প্রেমাশ্রয়ী শাখার কবি মলিক মোহম্মদ জায়সী অবধী ভাষায় 'পদ্মাবত' রচনা করেন। এটা এক প্রেমাখ্যানক মহাকাব্য। এতে জায়সী নিজেই লিখেছেন যে ঐতিহাসিক বিখ্যাত চরিত্র মহারানী পদ্মিনী এবং রতন সেনদের কাজ এবং চরিত্র অবলম্বনে, তাতে ভাবনা আর কল্পনার সমাবেশ করে, তিনি রচনা করেছেন।

"তন চিতউর মন রাজা কীন হা,
হির সিখল বুদ্ধি পদ্মিনি চীনহা।
গুরু সুবা জেহি পংথ দিখাবা,
বিন গুরু জগত কো নিরগুণ পাবা।
নাগমতী যহ দুনিয়া ধংধা,
বাঁচা সোই ন এহি চিত বাধা।
রাঘবদূত স্যেই-সৈতানু, মায়া অলাদ্দীন সুলতানু।
তো মন জানি কবিও তাস কীনহা,
মক্ত যহ রহি জগত মহ বীন্হা।"

অর্থাৎ জায়েসী লিখছেন সাধকের মন রতনসেন, শরীর চিতোর, তোতাপাখি গুরু দ্বারা সাত্বিক জ্ঞান লাভ করে অন্ততোগত্বা জীব মোক্ষ লাভ করে। হৃদয় সিংঘল দ্বীপ, পদ্মাবতী পরমাত্মা, নাগমতি সাংসারিকতা, রাঘব চৈতন্য আর আলাউদ্দীন আসুরিক শক্তির প্রতীক।

তাই এই রকম এক কাল্পনিক গ্রন্থকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া মানে আমাদের অল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। এবং ডা. কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতন এক পণ্ডিত এর দ্বারা লেখা নিজের গ্রন্থ 'স্টাডিজ ইন রাজপূত হিস্ট্রী'তে

মহারানী পদ্‌মিনী আর তার জৌহরকে অসত্য, অপ্রমাণিত, কপোল কল্পিত বললেও সত্যের সূর্যকে ঢাকা যাবে না।

প্রকৃতপক্ষে মহারানী পদ্‌মিনি রূপ এবং শীল এ যেমন অতুল্য ছিলেন, তেমনিই তিনি রাজনীতি এবং যুদ্ধ কৌশলেও সুদক্ষ ছিলেন। ডা. লক্ষণসিংহ রাঠোর নিজের বিরচিত— 'The Johar of Padmini' তে রাণা রতনসিংহ, যিনি শূরবীর এবং পরাক্রমী শাসক ছিলেন, তার জন্য কেমন সুন্দর ভাষায় নিজের উদ্‌গার প্রকাশ করেছেন—

"Ratan, a warrior of fame! Never could he flinch to defend the freedom of the lord and the pride of Padmini Honour!"

মহারানী পদ্‌মিনির সৌন্দর্যের সম্পর্কেও ডা. লক্ষণ সিংহর বাণী শ্রেষ্ঠতার শিখরে—

"Padmini was the queen of paradise,
Beaming like the may splendored rainbow
The Sun and Moon stopped in their track
to have a look at the beauticous queen."

সার-সংক্ষিপ্ত শেষেতে—

"চিতোর জৌহর জ্বালা কা
এক পর্যায় য়হাঁ।
স্বাভিমানী সংস্কৃতি কা
এক স্বাধ্যায় য়হাঁ।
খণ্ডহর হোকর ভী হম সবকে লিয়ে
আন বান শান কা এক খুলা অধ্যায় হৈ যহাঁ।"